কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞান

ফেব্রুয়ারি ৮২

Hard Copy & Scan - Subhajit Kundu
Edit - Optimus Prime

This e-copy is scanned and preserved by
Dhulokhela Team Members

Anyone Can Contribute to our project by
giving their rare magazines for scan.

Reach us at
optifmcybertron@gmail.com

টোয়েন্টি থাউজেণ্ড লীগস্ আণ্ডার দি সী : লেখা ও ছবি গৌতম কর্মকার

চিঠিপত্র

ডিসেম্বর, ১৯৮১'-র কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞানে-পড়াশোনা বিভাগে' অমরনাথ রায়ের 'রসায়নের সহজ পাঠ' রচনাটি ভাল লাগল। লেখক বলেছেন—"যে পদার্থ বা পদার্থগুলি রাসায়নিক বিক্রিয়ায় অংশ গ্রহণ করে তাদের বলা হয় 'বিকারক'। আর বিক্রিয়ার ফলে নতুন ধর্মবিশিষ্ট যে সব পদার্থ উৎপন্ন হয়, তাদের বলা হয় 'বিক্রিয়াজাত' বা 'বিক্রিয়ালব্ধ পদার্থ।"

উদাহরণস্বরূপ তিনি বলেছেন—"জিংক বা দস্তার সঙ্গে লঘু সালফিউরিক অ্যাসিডের বিক্রিয়ায় জিংক সালফেট ($ZnSo_4$), লবণ ও হাইড্রোজেন গ্যাস উৎপন্ন হয়। এক্ষেত্রে রাসায়নিক বিক্রিয়ায় অংশ গ্রহণকারী পদার্থ অর্থাৎ বিকারক হল জিংক ও সালফিউরিক অ্যাসিড। আর বিক্রিয়ার ফলে নতুন ধর্ম বিশিষ্ট পদার্থ বা 'বিক্রিয়াজাত পদার্থ' হল জিংক সালফেট ও হাইড্রোজেন!"

কিন্তু লবণকে 'বিক্রিয়াজাত পদার্থ' বলেন নি। বিক্রিয়ার ফলে যেমন $ZnSo_4$ ও H_2 উৎপন্ন হয় তেমনি লবণও উৎপন্ন হয়। কাজেই লবণও 'বিক্রিয়াজাত বা বিক্রিয়ালব্ধ পদার্থ।'

তাই লেখকের কাছে আমার প্রশ্ন লবণ কি 'বিক্রিয়াজাত বা বিক্রিয়ালব্ধ পদার্থ' নয়? কেন?

বরুণদেব ব্যানার্জী, মাটিয়ারী, নদীয়া

অক্টো-নভেঃ সংখ্যায় নারায়ণ বাবুর লেখা 'সমুদ্র-দানব অক্টোপাস' নামক প্রবন্ধটি সত্যিই জ্ঞানপিপাসুদের যথেষ্ট খোরাক জুগিয়েছে, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। কিন্তু একটা দিক উপেক্ষিত হয়েছে—'দানব' কথাটা উল্লেখিত হওয়ায় আয়তন (বিশেষ করে পরিণত অবস্থায় মাথা থেকে শুঁড়ের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত দীর্ঘতা) সম্পর্কে ছোট একটি জিজ্ঞাসা মনের কোণে উঁকি দেয়।

মোটামুটি ভাবে একটা পরিণত অক্টোপাসের দীর্ঘতা সংযোজন করলে সর্বশ্রেণীর তথা কিশোর পাঠক-পাঠিকাদের সহজাত কৌতূহল নিবৃত্ত হত।

জাফরুল্লা খাঁন, মোহনপুর, (২৪ পরগণা)

১৩৮৮ সালের শারদীয়া কিশোর-জ্ঞান-বিজ্ঞান পত্রিকায় শ্রীকুমার রায়ের 'সাধারণ রোগ ও তার প্রতিকার' প্রবন্ধে এক জায়গায় তিনি লিখিয়াছেন যে কাটা জায়গায় টিঞ্চার আয়োডিন বা নির্ভেজাল ডেটল লাগিও না।' এই কথাটা আমার মনে কৌতূহল জাগাচ্ছে। কারণ আমরা জানি টিঞ্চার আয়োডিন ও ডেটল কাটা জায়গাতেই লাগায়। সুতরাং সকলের অজ্ঞাত এই কথাটি যদি তিনি কারণ দিয়ে লিখতেন তবে আমি আনন্দিত হতাম।

শ্রীমোহন চট্টোপাধ্যায়, শ্যামনগর, শান্তিগড়, ২৪ পরগনা।

আমি কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞানের নিয়মিত একজন কিশোর পাঠক। গত অক্টোবর-নভেম্বর (১৯৮১) সংখ্যার বিজ্ঞান বিচিত্রায় "মানুষ যদি দৈত্য হত" প্রবন্ধে একটা বিষয় সম্পর্কে লেখকের সঙ্গে আমার একটু মতানৈক্য আছে। উক্ত প্রবন্ধে লেখক প্রথমেই কোন ব্যক্তির দৈত্যে হওয়ার কারণ সম্পর্কে ওষুধ খাওয়া বা ইন্‌জেকশান দেয়ার কথা উল্লেখ করেছেন। এই ওষুধের প্রতিক্রিয়ায় ঐ ব্যক্তির আয়তন ২৭ গুণ হওয়া সম্ভবপর, কিন্তু ওজনের ২৭ গুণ বৃদ্ধির কারণ আমি ঠিক বুঝতে পারিনি। কারণ ঐ ওষুধ অথবা ইন্‌জেকশনের ওজন নিশ্চয়ই ঐ ব্যক্তির ওজনের ২৬ গুণ নয়। এই কারণেই ঐ ব্যক্তির শারীরিক পদার্থের ঘনত্ব এক থাকা সম্ভবপর নহে। আবার একই কারণে বলা যায় যে ঐ ব্যক্তির হাড়গুলি শারীরিক সামঞ্জস্যে মোটা হওয়া সম্ভব কিন্তু মজবুত হওয়ার খুব বেশী প্রয়োজন আছে কি?

সুধীর বিশ্বাস

১৬৮, ডঃ মেঘনাদ সাহা রোড, কলকাতা-৭৪, দমদম

লেখকের উত্তর: মানুষকে আমরা যেভাবে চিনি বা জানি তাতে তার আয়তন ছোট বা বড় যাই করা হোক না কেন, তার শারীরিক উপাদানের ঘনত্ব একই রাখা ভীষণভাবে প্রয়োজন। কারণ হিসেবে অসংখ্য উদাহরণ দেওয়া সম্ভব, কিন্তু একটা ছোট্ট উল্লেখই হয়তো যথেষ্ট। একবার ভেবে দেখুন তো, যদি আমাদের রক্তের ঘনত্ব এখন যা আছে তার সাতাশ ভাগের এক ভাগ হয়ে যায়?

সুতরাং মানুষকে স্বাভাবিক মানুষ রাখতে গেলে ঘনত্ব একই থাকাটা যদি একান্ত প্রয়োজনীয় হয়, তাহলে হাড়গুলোর যে মজবুত না হয়ে কোন উপায় থাকে না।

অনীশ দেব

কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞানের অক্টো-নভেঃ সংখ্যায় "ভেবে বল—কোনটা ঠিক" (অনিলকুমার ঘাঁটা লেখক) নামক প্রশ্নোত্তরে ছিল পরমাণু বোমার আবিষ্কারক "লিজে-মাইট্‌নার"। কিন্তু আমি "ছোটদের বুক অব নলেজ" বইয়ের ৮২৩ পাতায় দেখলাম যে পারমাণবিক বোমার আবিষ্কারক আমেরিকার "জুলিয়াস ওপেন হাইমার"। এখন আমার প্রশ্ন হল,

(1) উপরিলিখিত আবিষ্কার দুটি কি একই আবিষ্কার? (2) যদি তাহা হয়, তবে প্রথম আবিষ্কারক হিসাবে দুইজনের নাম কেন উল্লেখ করা হল? (3) যদি তাহা না হয় তবে উপরিলিখিত আবিষ্কার দুটির পার্থক্য কি?

শ্রীআশীষ চ্যাটার্জী

কনকশালী বোসের ঘাট, পোঃ—চুঁচুড়া, জেলা—হুগলী

কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞান

১ম বর্ষ ৯ম সংখ্যা ॥ ফেব্রুয়ারী ১৯৮২
প্রধান সম্পাদক ঃ সমরজিৎ কর
সম্পাদক ঃ রবীন বল
সহ-সম্পাদক ঃ জয়ন্ত দত্ত

সম্পাদকীয়

মাধ্যমিক পরীক্ষাতো এসে গেল। মার্চের গোড়ায়। তোমরা যারা মাধ্যমিক পরীক্ষায় বসছ, তাদের জন্য কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞানের বর্তমান সংখ্যাটি খুবই মূল্যবান। কারণ বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও মাস্টার মশাইরা তোমাদের জন্য বেশ কয়েকটি মূল্যবান লেখা লিখেছেন। ভৌত-বিজ্ঞান, জীবন-বিজ্ঞান ও গণিত, এই তিনটি বিষয়ের উপরে লিখেছেন, ডঃ অলক চক্রবর্তী, ডঃ অসীম মুখোপাধ্যায়, ডঃ তারক মোহন দাশ, অমর নাথ রায় প্রমুখ বিশিষ্ট শিক্ষক ও শিক্ষাবিদগণ— যে সব লেখা অনিবার্যভাবেই পরীক্ষায় তোমাদের সাফল্য অর্জনে সহায়ক হবে।

॥ সূচীপত্র ॥

সম্পাদকীয় ঃ ২
চিঠিপত্র ঃ ১
দপ্তর থেকে
টেকো‌াইটস ॥ সমরজিৎ কর ৩
উপন্যাস
শার্লক হোমস্ চ্যালেঞ্জার
ও মঙ্গলগ্রহ ঃ অদ্রীশ বর্ধন ৯
গল্প
অতিথি ॥ সুধাংশু পাত্র ১৬
বিজ্ঞানের বিস্ময়
আঠারো কোটি বছরেও যে
দাঁত পড়েনি ॥ অমিতাভ সেন ১৪
পড়াশোনা
জীবনবিজ্ঞানের আলোচনা ॥ তারকমোহন দাশ ৪২
ভৌত-বিজ্ঞানের সম্ভাব্য প্রশ্ন ॥ অমরনাথ রায় ৪৪
পদার্থ-বিদ্যা ঃ সম্ভাব্য প্রশ্নোত্তর ॥ অলক চক্রবর্তী ৩৩
অঙ্কে পাশ করতে হলে ॥ শুভঙ্কর ব্যানার্জী ৪১
লেখচিত্র অঙ্কনে সতর্ক হওয়া উচিত ॥
ডঃ অসীম মুখোপাধ্যায় ২৭
জীবন বিজ্ঞানের সম্ভাব্য প্রশ্ন ॥ দিনোজ কুমার দে ৪৩
ছবিতে গল্প
অজানা মহাকাশে ঃ দেবদাস ৩২
বিজ্ঞানসাধক জগদীশচন্দ্র ঃ দিলীপ দাস ২৩
টোয়েন্টী থাউজেণ্ড লীগস আণ্ডার দি সী ॥
গৌতম কর্মকার ॥ প্রচ্ছদ ২
হাবুলের বিজ্ঞান ভাবনা ঃ ধীরেন বল ৫৬
ছবির মজা ১, ২ ॥ ১৯
পশুপাখীর গল্প
ভারতের বিরল প্রাণী ॥ সুনীত রায় ৬
জ্ঞান-বিজ্ঞানের রচনা
অদ্ভুত ডিমবাজী ॥ এ. সি. সরকার ২০
শুক্রগ্রহের বায়ু মণ্ডল ॥ বিজয় বল ১২
নতুন পাঠক্রমের ভাবনা ॥ কিন্নর রায় ২৬
আচার্য সত্যেন বসু বিজ্ঞান সংসদ ॥ ২২
মাছের জলপান ॥ হীরক দাস ১৫
মাটি থেকে আকাশে ঃ পার্থসারথি চক্রবর্তী ৩৯
বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানী
আইভ্যান পেত্রোভিচ্ প্যাভলভ ॥ বিবেক রায় ২৩
আবিষ্কারের গল্প
হ্যারিকেনের জন্ম বৃত্তান্ত ॥ শচীনন্দন আঢ্য ৮
ছোটদের দপ্তর
প্রশ্নোত্তর ঃ ৪৯ বিজ্ঞান জিজ্ঞাসার সমাধান ৫১
ভেবে বল'র উত্তর ৫১ ॥ শব্দকূটের সমাধান ৫৫
চাঁদে ওলিম্পিক ॥ প্রদীপ্ত সরকার ৫২
একটি ইলেকট্রিক মডেল ॥ জ্যোতিষ সরকার ৫০
ভেবে বল কোনটা ঠিক ॥ চন্দনকুমার রুদ্র ৫৫
বিজ্ঞান জিজ্ঞাসা ॥ শ্রীবৈজ্ঞানিক ৫৫
মানবদেহ সম্পর্কিত প্রশ্নোত্তর ৫১

ছবি এঁকেছেন ঃ সঞ্জয় ভট্টাচার্য

দপ্তর থেকে

টেকটাইটস

সমরজিৎ কর

বছর দশেক আগের কথা। বিল্লি পি. গ্লাস এবং ব্রুস সি. হিগেন নামে দু'জন সমুদ্রবিজ্ঞানী ভারত মহাসাগর এবং দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরের গর্ভে অনুসন্ধান চালিয়ে সংগ্রহ করে নিয়ে এলেন কাচের মত কতকগুলি বস্তু, কাচ-পাথর, বিচিত্র তাদের বর্ণ এবং আকৃতি, এর আগে অষ্টাদশ এবং উনবিংশ শতাব্দীতে পৃথিবীর স্থলভাগেও অনুরূপ পাথরের সন্ধান পাওয়া গিয়েছিল। পরীক্ষা নিরীক্ষার পর তাদের মূল উপাদান সম্পর্কে অনেক তথ্যই জানতে পেরেছেন বিজ্ঞানীরা। রহস্য যা তা হলো, কেন এবং কীভাবে তারা তৈরি হয়েছে তার সঠিক ব্যাখ্যা আজও কেউ দিতে পারেন নি।

গ্রীক ভাষায় 'টেকটোস' শব্দটির অর্থ 'গলিত'। ওই সব কাচ পাথর এক সময় যে গলিত অবস্থায় ছিল তার প্রমাণ পাওয়া গেছে। তাই ওদের নাম রাখা হয়েছে 'টেকটাইটস'। মজার ব্যাপার এই, বিজ্ঞানীরা গত দু'শ বছর ধরে ওই বস্তুকণা নিয়ে নানা রকম জল্পনা করে আসছেন। কেউ বলছেন, পৃথিবীর ভূতাত্ত্বিক আগ্নেয় কার্যকলাপের ফলেই তারা সৃষ্ট হয়েছিল। অনেকের ধারণা অনৈসর্গিক কোন কারণে ওরা এক সময় আকাশ থেকে পৃথিবীর বুকে বৃষ্টিবিন্দুর মত ঝরে পড়েছে। আবার কেউ বলছেন, চাঁদ এবং অনুরূপ কোন গ্রহই তাদের উৎপত্তিস্থল। অদ্ভুত কাণ্ড, অ্যাপেল ১১ মহাকাশযানে পৃথিবীর মানুষ চাঁদের বুকে অবতরণ করে সেখানেও এ ধরণের কাচ-পাথরের সন্ধান পেয়েছে। কিন্তু চাঁদের দেশেই বা কী করে তারা এলো সে রহস্যও এখনও পর্যন্ত উদ্ঘাটন করা সম্ভব হয়নি।

মাঝে সাইবেরিয়ার একটি ঘটনার সঙ্গে ওই কাচ পাথরের জন্ম কাহিনী জুড়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন বিজ্ঞানীরা। ৩০ জুন, ১৯০৮ সাল। ওই দিন সকাল সাতটার কিছু পরে আকাশ থেকে একটি দৈত্যাকার আগুনের পিণ্ড ঝাঁপিয়ে পড়লো সাইবেরিয়ার টুনগুসাকা উপত্যকার গভীর জঙ্গলের উপর। কী প্রচণ্ডই না তার ঝলসানি! পরমুহূর্তে বিস্ফোরণ। এই বিস্ফোরণে প্রায় পঁচিশ মাইল জুড়ে একটি অঞ্চলের গাছপালা উপড়ে যায়। কাছেই ছিল দুটি যাযাবর পরিবার। প্রচণ্ড শব্দে তারা বধির হয়ে পড়ে। ওদের সঙ্গে ছিল বল্গা হরিণ। তাদের কেউ মারা পড়ে কেউ পালিয়ে যায়। বিস্ফোরণের শব্দ প্রায় আড়াইশ' মাইল দূর থেকেও শোনা গিয়েছিল। বায়ু-চাপমান এবং ভূকম্পনজ্ঞাপক যন্ত্রে পৃথিবীর সর্বত্র ধরা পড়েছিল তার কম্পন। এই ঘটনার পর বেশ কয়েকদিন সারা ইউরোপের আকাশ এক প্রস্থ হাল্কা রূপোলী মেঘে আচ্ছন্ন হয়ে থাকে।

জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা ভেবেছিলেন, আকাশ থেকে বিরাট একটি জ্বলন্ত উল্কাপিণ্ডের পতনই হয়ত ওই বিস্ফোরণের কারণ। কিন্তু জায়গাটি খুঁটিয়ে পরীক্ষা করে উল্কার কোন চিহ্নই সেখানে পেলেন না। পাওয়া গেল খুদে খুদে অজস্র কাচের টুকরো। রুশ এবং মার্কিন বিজ্ঞানীরা টুকরো-গুলি পরীক্ষা করে সিদ্ধান্ত করলেন, সেদিন কোন একটি ধূমকেতু অজ্ঞাত কোন কারণে হঠাৎ পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল ভেদ করে সেখানে ঠিকরে পড়েছিল, এর জন্যেই ওই বিস্ফোরণ। সেখানে যে কাচের টুকরো পাওয়া যায় তারা ওই ধূমকেতুর 'চোখ' বা নিউক্লিয়াসেরই ভগ্নাবশেষ। টেকটাইটের সঙ্গে ওই কাচের মিলও পাওয়া গেল।

প্রশ্ন তুললেন বিজ্ঞানীরা: সাইবেরিয়ার ওই কাচকণা, ভারত এবং প্রশান্ত মহাসাগর থেকে সংগৃহীত কাচ পাথর এবং অ্যাপলো ১১-র মহাকাশচারীরা চাঁদ থেকে কাচের যে ধূলো নিয়ে আসে তারা সবাই কি টেকটাইটস? শুধু জ্যোতির্বিজ্ঞানীই নয়, ভূতাত্ত্বিক, রসায়নবিদ থেকে গতি-বিদ্যা নিয়েও যাঁরা চর্চা করেন, তাঁরাও এই কাচ-পাথর বা টেকটাইটস নিয়ে এখনও মাথা ঘামাচ্ছেন। কিন্তু আজও পর্যন্ত তাদের সঠিক পরিচয় এখনও পর্যন্ত তাঁরা বুঝে উঠতে পারেন নি।

বিল্লি এবং হিগেন অস্ট্রেলিয়া থেকে শুরু করে দক্ষিণ আমেরিকার উপকূল পর্যন্ত মহাসাগরের নিচে কাচ পাথর ছড়িয়ে থাকতে দেখেছেন। এ ছাড়া আরও চারটি অঞ্চলে এদের ছড়িয়ে থাকতে দেখা গেছে। এবং প্রাপ্তিস্থানের নাম অনুসারে এই সব পাথরের নামকরণও করেছেন বিজ্ঞানীরা। যেমন ধরো, 'মলডেভাইটস', বিশেষ ধরণের এই টেকটাইটের কথা প্রথম জানা গিয়েছিল ১৭৮৭ সালে। পশ্চিম চেকোস্লোভাকিয়ার মলদাউ নদীর উপত্যকায় প্রথম আবিষ্কার করেন জোসেফ মেয়র নামে জনৈক বিজ্ঞানী। দ্বিতীয় শ্রেণীর টেকটাইটসকে বলা হয় 'অস্ট্রেলাইটস', ১৮৬৪ সালে অস্ট্রেলিয়ার আদিবাসীদের কাছ থেকে এ ধরণের কাঁচ পাথর প্রথম সংগ্রহ করেছিলেন বিশ্বখ্যাত

প্রকৃতিবিজ্ঞানী চার্লস ডারউইন। পরে অস্ট্রেলিয়ার দক্ষিণাঞ্চল, পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের কয়েকটি জায়গায়, ইন্দোনেশিয়া এবং ফিলিপিনসের ব্যাপক অঞ্চলে এ ধরণের টেকটাইটসের সন্ধান দিয়েছেন একাধিক ভূতাত্ত্বিক। তৃতীয় শ্রেণীর টেকটাইটসকে বলা হয় 'আইভরি কোস্ট টেকটাইটস।' এ ধরণের কাচ-পাথর খুব কমই পাওয়া গেছে। এদের প্রথম আবিষ্কার করেন লাক্রোইকস নামে জনৈক ভূতাত্ত্বিক ১৯৩৫ সালে। চতুর্থ শ্রেণীর টেকটাইটস পাওয়া গেছে উত্তর আমেরিকার টেকসাস, জর্জিয়া প্রভৃতি অঞ্চলে।

এক এক অঞ্চলের টেকটাইটসের বৈচিত্র্যও এক এক রকম। যে সব টেকটাইটস চেকোস্লোভাকিয়ায় পাওয়া গেছে তাদের বেশির ভাগই ঈষৎ স্বচ্ছ। গাঢ় অথবা হাল্কা সবুজ রঙের। দেখলে মনে হয়, কে যেন তাদের গায়ে খানিকটা কারুকার্য করে দিয়েছে। জর্জিয়ার কাচ-পাথরও দেখতে কতকটা এই রকম। এ ছাড়া কোন কোন অঞ্চলের টেকটাইটের রঙ ঘোর কালো। পাশ থেকে দেখলে মনে হয় এদের মধ্যে বাদামী ধুঁয়ো যেন কুণ্ডলী পাকিয়ে স্থির হয়ে ছড়িয়ে রয়েছে।

পরে জানা গেল, সভ্য মানুষ এই কাচ পাথরের কথা অজ্ঞাত থাকলেও অস্ট্রেলিয়া এবং আইভরি কোস্টের আদিবাসীরা প্রাচীনকাল থেকেই এদের সন্ধান রেখেছিল। তারা মনে করতো অদ্ভুত দর্শন এই সব পাথর তাদের রোগ, শোক এবং বিপদ থেকে রক্ষা করে। তাই টেকটাইটসের আসন তাদের কাছে ছিল দেবতার মত।

সে যাই হোক। বিজ্ঞানীরা কিন্তু ভাবছেন অন্য কথা। তাঁদের প্রশ্ন, কয়েকটি নির্দিষ্ট অঞ্চল ছাড়া এই ধরনের পাথর অন্যত্র কেন পাওয়া যায় নি? এদের গঠন বৈচিত্র্যই বা অমন হলো কেন? আগ্নেয় শিলার মধ্যে কাচের মত বস্তুখণ্ড পাওয়া যায়। অথবা কোন উল্কা-পিণ্ড যখন প্রচণ্ড বেগে ভূ-পৃষ্ঠে এসে আঘাত করে তখন সৃষ্ট হয় প্রচণ্ড উত্তাপ। সেই উত্তাপে উল্কাপিণ্ডটি গলে গিয়ে তৈরি করে এক ধরনের কাচের মত পদার্থ। মজার ব্যাপার এই আগ্নেয়শিলার অথবা উল্কার ওই কাচের থেকে টেকটাইটস আলাদা। সাধারণ কাচের চেয়ে টেকটাইটস অনেকটা ভারী। এদের মধ্যে সিলিকার পরিমাণ শতকরা ৬৮ থেকে ৮২ ভাগ। অবশিষ্টের অর্ধেক অ্যালুমিনা, বাকি ম্যাগনেশিয়াম এবং লোহার অকসাইড। অন্যান্য পাথরের মত টেকটাইটসের মধ্যেও জল থাকে। তবে তার পরিমাণ খুবই কম।

বিজ্ঞানীরা টেকটাইসের বাইরের গঠন খুঁটিয়ে পরীক্ষা করছেন। তাঁদের ধারণা ঊর্ধাকাশ থেকে বায়ুস্তর ভেদ করে ওরা এক সময় পৃথিবীর বুকে ছুটে এসেছিল। প্রচণ্ড বেগে অগ্রসর হওয়ার সময় বাতাসের ঘর্ষণে তাদের সামনের দিকটি গলে যায়। কিছুটা অংশ বিচ্ছিন্নও হয় হয়ত। যেটুকু অবশিষ্ট থাকে তার সামনের অংশ সুঁচলো হয়ে ওঠে। পেছনের অংশ পায় নানা রকম আকৃতি। পরে দীর্ঘকাল পৃথিবীর বুকে পড়ে থাকার সময় বাতাস, জলের প্রবাহ এবং ধুলোবালির ঘর্ষণে তাদের ক্ষয় হয়। এবং শেষ পর্যন্ত তাদের চেহারা দাঁড়ায় কোথাও ডামবেলের মত, কোথাও বা লেন্স কিংবা নৌকার মত। কোন কোন টেকটাইটস দেখলে মনে হয় তারা যেন অশ্রুবিন্দু। কে যেন বিন্দু বিন্দু অশ্রু হঠাৎ জমাট পাথরে পরিণত করেছে। আয়তনে বেশির ভাগই ছোট। গড় ওজন মাত্র কয়েক গ্রাম। বৃহত্তমটির ওজন ৩·২ কিলোগ্রাম। বিজ্ঞানীরা এ পর্যন্ত মোট সাত লক্ষ পঞ্চাশ হাজারটি টেকটাইটস সংগ্রহ করেছেন।

কত বয়েস টেকটাইটসের?

এ নিয়েও নানা মুনির নানা মত। বলা হচ্ছে ফরমোসা এবং ফিলিপিনস থেকে সে সব টেকটাইটস সংগ্রহ করা হয়েছে তাদের বয়েস প্রায় সাত লক্ষ বছর। অস্ট্রেলাইটসেরও বয়েসও ওই রকম। চেকোশ্লোভাকিয়া, টেকসাস এবং আইভরি কোস্টের টেকটাইটসের বয়েস যথাক্রমে এক কোটি চোদ্দ লক্ষ, তিন কোটি চৌত্রিশ লক্ষ এবং দশ লক্ষ বছর।

কীভাবে তৈরি হলো টেকটাইটস?

এ নিয়েও নানা রকম জল্পনা। একদল বিজ্ঞানী বলেছেন, কোন কারণে হয়ত প্রচণ্ড অগ্নিকাণ্ড ঘটেছিল। সেই আগুনের পাথর এবং বালুকণা গলে গিয়ে তৈরি করে টেকটাইটস। অবশ্য এই মতবাদ শেষ পর্যন্ত আর ধোপে টেঁকেনি। মতবাদটি যারা নাকচ করেছেন, তাঁদের বক্তব্য, অগ্নিকাণ্ডের দরুণই যদি তারা সৃষ্ট হয়, তা হলে সমুদ্র গর্ভে তাদের পাওয়া গেল কেন? জলের নিচে নিশ্চয় আগুন জ্বলতে পারে না? আর একটি মতবাদে বলা হয়েছে, বড়সড় উল্কা অথবা ধূমকেতুও টেকটাইটস সৃষ্টি করতে পারে। এটি ব্রিটিশ মিউজিয়ামের বিজ্ঞানী এল. কে. স্পেনসারের মতবাদ। তাঁর বক্তব্য, ধরা যাক, অতিকায় একটি উল্কা বায়ুস্তরের মধ্যে দিয়ে পৃথিবীর দিকে এগিয়ে আসছে। প্রচণ্ড তার গতি। বাতাসের ঘর্ষণে তার বাইরের অংশ প্রচণ্ড উত্তপ্ত হলো। গলে গেল। সেই গলে যাওয়া অংশ বৃষ্টি বিন্দুর মত

ভূ-পৃষ্ঠে ছড়িয়ে পড়লো। আর তারাই শীতল হয়ে তৈরি করলো এক একটি টেকটাইট কণা।

কিন্তু স্পেনসারের এই মতবাদও অনেকে নাকচ করেছেন শেষ পর্যন্ত। বলা হচ্ছে, কী করে তা সম্ভব। উল্কা যদি গলেও, ভূ-পৃষ্ঠের কাছাকাছি এসে তার তো ঠাণ্ডা হয়ে জমে যাওয়ার কথা। সে ক্ষেত্রে গলিত অংশ বৃষ্টি বিন্দুর মত ঝরতে পারে না। অবশ্য এখনও হতে পারে, প্রচণ্ড গতিতে সেই উল্কা হয়ত কোন পাহাড়ে এসে আঘাত করলো। সেই আঘাতে পাহাড়ের উপরের অংশ গরম হয়ে গলে গেল। পাহাড়ের গলন্ত অংশ তখন কাচ-পাথর সৃষ্টি করতে পারে। কিন্তু সেই পাথরে পাহাড়ের উপাদান তো থাকবে? কিন্তু তেমন কিছু দেখা যায় নি।

ধূমকেতুর কথা বলছেন নোবেলবিজ্ঞানী ইউরে। তাঁর মতে কোন কোন ধূমকেতু হয়ত পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণের মধ্যে এসে পড়ে। সেই মাধ্যাকর্ষণের টানে প্রবল বেগে আছড়ে পড়ে পৃথিবীর বুকে। তারপর তার গ্যাসীয় অংশ জমে গিয়ে সৃষ্টি করে টেকটাইট টুকরো।

জল্পনার এখানেই কি শেষ। এ প্রসঙ্গে সোভিয়েত বিজ্ঞানীরা উপস্থাপন করেছেন খুবই নাটকীয় একটি ব্যাখ্যা। ওঁরা বলছেন পৃথিবীর উত্তর এবং দক্ষিণে আছে দুটি চৌম্বক মেরু। এই চৌম্বক মেরু এখন যেখানে রয়েছে, চিরকাল তারা কিন্তু সেখানে ছিলো না। পৃথিবীর উত্তর-চৌম্বক মেরু কখনও সরে এসেছে দক্ষিণ দিকে, দক্ষিণ চৌম্বক মেরু সরে গেছে উত্তরে। চৌম্বক-মেরুর এই স্থান পরিবর্তনের জন্যে দায়ী অতিকায় ধূমকেতু অথবা উল্কা। অথবা দূর কক্ষে বিচরণরত অতিকায় কোন গ্রহাণু কিংবা চাঁদের ভেঙ্গে যাওয়া কোন টুকরো। ওরা প্রচণ্ড বেগে আঘাত করে পৃথিবীর বুকে এসে। সেই আঘাতের ধাক্কায় পৃথিবীর চৌম্বক মেরু স্থান পরিবর্তন করে।

বিজ্ঞানীরা পরীক্ষা করে দেখেছেন, শেষ বারের মত পৃথিবীর ভূ-চৌম্বক মেরুর স্থান পরিবর্তন ঘটেছিল আজ থেকে প্রায় সাত লক্ষ বছর আছে। দেখা যাচ্ছে, কোন কোন টেকটাইটের বয়েসও প্রায় সাত লক্ষ বছরের মত। বিশেষ করে অস্ট্রেলিয়া এবং ভারত মহাসাগরে যে সব টেকটাইটস পাওয়া গেছে তাদের বয়েস তো ওই রকমেই। তাই কেউ কেউ ধারণা করছেন অতীতের সেই উল্কা। চাঁদের বিচ্ছিন্ন অংশ, গ্রহাণু অথবা ধূমকেতু, এদের কোন না কোনর বিগলিত অংশ থেকেই সৃষ্টি হয়েছিল টেকটাইটস।

যাই হোক। জল্পনা এখনও চলছে। ভবিষ্যতে হয়ত জানা যাবে ভৌচম্বক মেরুর স্থান পরিবর্তনের সঙ্গে আদৌ টেকটাইটসের কোন সম্পর্ক আছে কিনা। জানা যাবে টেকটাইসের জন্মের মূলে কোন উল্কা ধূমকেতু কিংবা চাঁদের কোন বিচ্ছিন্ন অংশ ছিলো কিনা।

মাধ্যমিক পরীক্ষাথাদের জন্য অপরিহার্য বই

ডঃ অলক চক্রবর্তী
ও শ্রীঅমিয়তোষ রায়

প্রণীত

বিজ্ঞান প্রবেশিকা (৩য়)
নবম শ্রেণী
ব্যবহারিক অংশ সংযোজিত
TB/IX/PS/81/1 Dated 10. 1. 81

বিজ্ঞান প্রবেশিকা (৪র্থ)
দশম শ্রেণী
ব্যবহারিক অংশ সংযোজিত
TB/X/PS/81/21 Dated 10. 1. 81

বিদ্যোদয় লাইব্রেরী প্রাইভেট লিমিটেড
৭২ মহাত্মা গান্ধী রোড ॥ কলিকাতা ৭০০০০৯

ভারতের বিরল প্রাণী

সুনীত রায়

মানবহৃদয়ের সরলতাময় মাধুর্যপূর্ণ অভিব্যক্তির নিশ্চিত প্রতীক হল, প্রকৃতি আর পশুপাখী। প্রকৃতির আত্মার অনবদ্য প্রকাশ ঘটে গহনগভীর জঙ্গলে আপন মনে বিচরিত বন্য জন্তু-জানোয়ারের অবাধ গতির মধ্যে দিয়ে। প্রকৃতির রূপমাধুরীর অবিভাজ্য অঙ্গ এই পশুপাখীদের নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করে মানুষ নিজের হাতেই এই প্রাকৃতিক সৌন্দর্য নষ্ট করে ফেলছে। এই ক্ষয়-প্রতিরোধ করার জন্য ১৯৬৯ সালে ওয়ার্ল্ড ওয়াইল্ড লাইফ্ ফাণ্ড-ইণ্ডিয়া যাকে এককথায় WWF-India বলা হয়, এরকম ধরনের একটা সংস্থা বোম্বাই শহরে গড়ে উঠল।

এই সংস্থার মূল উদ্দেশ্য হল যে সব প্রাণী নিরাপত্তার-অভাবে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে তাদের বাঁচিয়ে রাখা, বাস্তুসংস্থান মূলক গবেষণা ও সাধারণের কাছে পরিবেশ সংরক্ষণ বোধ জাগ্রত করা ও শিক্ষার মাধ্যমে স্কুল-কলেজের ছেলেমেয়েদের মধ্যে 'সংরক্ষণ' মানসিকতার উন্মেষ সাধন। সারা ভারতবর্ষে আজ এই সংস্থা ছড়িয়ে পড়েছে। কলকাতা, বোম্বাই, দিল্লী ও ব্যাঙ্গালোরে চারটি আঞ্চলিক অফিস ছাড়াও আহমেদাবাদ, বরোদা, জামশেদপুর ও বিভিন্ন জায়গায় মোট এগারোটি অফিস রয়েছে।

WWF-India-র পূর্বাঞ্চলীয় শাখার অন্যতম কর্ণধার হলেন শ্রীমতী অ্যানী রাইট। কলকাতায় এই সংস্থা ১৯৭৮ সালে তৈরী হয়েছে। 'সংরক্ষণ প্রকল্প' হিসেবে এঁরা কি কাজ করেছেন ও কি কাজ হাতে নিয়েছেন, এ'ব্যাপারে প্রজেক্ট অফিসার শ্রীমতি পূর্ণিমা দত্ত বললেন, আমাদের এই সংস্থা-বোম্বে ন্যাচারাল হিস্ট্রী সোসাইটি, ইণ্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব সায়েন্স-ব্যাঙ্গালোর, জুলজিক্যাল সার্ভে অব্ ইণ্ডিয়া বোটানিক্যাল সার্ভে অব্ ইণ্ডিয়া ও কেন্দ্রীয় এবং সরকারী বনবিভাগের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে বিভিন্ন কাজ হাতে নিয়েছেন।

যে সব প্রাণী কালের অতল তলে তলিয়ে যাচ্ছিল—সে সব প্রাণীদের বাঁচিয়ে রাখার জন্যে এই সংস্থা অনেক 'পক্ষী আশ্রয়স্থল', 'অভয়ারণ্য' তৈরী করেছেন ও তৈরী করতে আর্থিক সাহায্যও দিয়েছেন। যে সব বিপদগ্রস্ত প্রাণীদের সংরক্ষণের জন্যে এঁরা কাজ করেছেন, তাদের মধ্যে রয়েছে, গিরিঅরণ্যে বসবাসকারী এশিয় সিংহ, যাদের বর্তমান সংখ্যা মাত্র ২০৫টি। কালো গলা সারস, এরাও খুব সামান্য সংখ্যায় লাডাক, ভুটান ও অরুণাচল প্রদেশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। ম্যাকাকিউ, একধরনের প্রাণী—এদের সিংহের মতো লেজ আছে, এরা পৃথিবীর নিঃশেষিত প্রাণীদের মধ্যে একটি। পূর্বঘাট পর্বতমালার দক্ষিণে খুবই সামান্য সংখ্যায় এরা রয়েছে। ভারতের এক শৃঙ্গ বিশিষ্ট গণ্ডারের

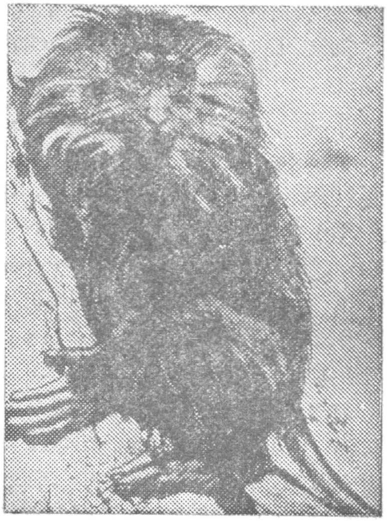

সিংহের মতো দেখতে লেজ বিশিষ্ট বিচিত্র প্রাণী ম্যাকাকিউ

সংখ্যা বাড়ানো হচ্ছে। এছাড়া বন্য কুকুর, সাইবেরিয়ান সারস তো রয়েছে। এইসব প্রাণীর সংরক্ষণ ও রক্ষণাবেক্ষনের জন্যে বান্দিপুর ইকোলজিক্যাল সার্ভে, ভালমা পার্বত্য পক্ষী নিবাস, জাগারা উপত্যকা, সাইলেণ্ট উপত্যকা, মুলামুথা পক্ষী নিবাস প্রভৃতি অভয়ারণ্য তৈরী করা হয়েছে ও এধরনের আরো অভয়ারণ্য তৈরী করার প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে।

ছেলেমেয়েদের মধ্যে 'পরিবেশ সংরক্ষণ' সম্বন্ধে উৎসাহিত করার জন্যে WWF-India ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গায় 'নেচার ক্লাব' (Nature Club) খোলার ব্যাপারে আগ্রহী হয়েছে। বর্তমানে সারা ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে ৪৬২টি নেচার ক্লাব খোলা হয়েছে।

পশ্চিমাঞ্চলে নেচার ক্লাবের সংখ্যা	—৩০৮
দক্ষিণাঞ্চলে	=১১৩
উত্তরাঞ্চলে	" =৫৪
পূর্বাঞ্চলে	" =৩১

WWF-India-র কলকাতার কেন্দ্রটি বছর দুয়েক হল 'পরিবেশ' সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রদর্শনী, স্লাইড সহযোগে বক্তৃতামালা আয়োজন ও জলদাপাড়া সুন্দরবনের মতো

ভারতের গর্ব একশৃঙ্গ গণ্ডার

বিভিন্ন অরণ্যে নেচার ক্লাবের ছেলেমেয়েদের নিয়ে গিয়ে সেখানকার গাছপালা, কীটপতঙ্গ ও বন্য প্রাণীদের সঙ্গে ভাব বিনিময়ের মাধ্যমে আদান-প্রদান ঘটিয়ে পরিবেশ সম্বন্ধে জ্ঞান আহরণ করানো সম্বন্ধীয় বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণ করে কাজ করছে। গত ১৯শে ফেব্রুয়ারী ১৯৮০ তে টেরিটোরিয়াল আর্মি ইন্সটিটিউট প্যাভিলিয়নে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল টি. এন. সিং-এর সভাপতিত্বে ও বনমন্ত্রী শ্রীপরিমল মিত্রের পৌরহিত্যে 'Launching of a New Ard' শীর্ষক একটি প্রদর্শনী আয়োজিত হয়। এই প্রদর্শনীর আকর্ষণীয় বিষয়বস্তু ছিল ভারতবর্ষের হিমালয় থেকে শুরু করে সুন্দরবন পর্যন্ত সমস্ত বনের গাছপালা, প্রাণীর সমাবেশ ও বিশেষ পরিবেশ আলো ও শব্দের মাধ্যমে কৃত্রিম বনভূমি তৈরি করে—সাধারণ মনে বিভিন্ন বন সম্বন্ধে একটা সাধারণ ধারণা দেওয়া। এই অনুষ্ঠানে শ্রীমতী অ্যানী রাইট, বনমন্ত্রী পরিমল মিত্রের হাতে জলদাপাড়া অভয়ারণ্যে 'ওয়্যারলেস সার্ভিসের' জন্যে ৭২,০০০ টাকা তুলে দেন। 'আমাদের পরিবেশকে 'বাঁচাও' নিজে বাঁচো, অপরকে বাঁচতে দাও' এরকম ধরনের বিভিন্ন প্রদর্শনী ও পদযাত্রার আয়োজন বিভিন্ন সময়ে করা হয়েছে।

এই নেচার ক্লাবের সদস্য ১০ থেকে ২১ বছরের ছেলে-মেয়েদের মধ্যে সীমাবদ্ধ। যে কোনো সংস্থা বা যে-কোনো ব্যক্তি এককালীন ১০ টাকা রেজিস্টেশন ফি ও বাৎসরিক ২টাকা চাঁদা দিয়ে এদের সঙ্গে যুক্ত হতে পারে। এব্যাপারে আরো বিশদভাবে জানতে হলে টাটা সেণ্টারে প্রথমতলে WWF-India-র পূর্বাঞ্চলীয় অফিসে যেতে হবে।

WWF-India একটি সম্পূর্ণ সমাজসেবামূলক সংস্থা। এরা WWF-International ও IUCN এর (International Union for the Coservation of Nature and Natural Resources) সঙ্গে যুক্ত। এই সংস্থাটি স্টেট ব্যাঙ্ক অব্ ইণ্ডিয়া, বাটা ইণ্ডিয়া লিমিটেড, ইণ্ডিয়ান টোবাকো প্রমুখ সংস্থার অর্থানুকূল্যে ও বিভিন্ন শিল্পপতি ও প্রকৃতিপ্রেমী সংস্থার দানের উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল। আজ অব্দি এই সংস্থা সরকারী কোনোরকম সাহায্য পায়নি বটে তবে সরকারের সবরকম সহযোগিতা সবসময় পেয়েছে ও এখনও পাচ্ছেন।

WWF- India-র পূর্বাঞ্চলীয় অফিসে, শ্রীমতী জয়ন্তী ভট্টাচার্য, শ্রীমতী সুজাতা রায়চৌধুরী, শ্রীমতী পূর্ণিমা দত্ত, এঁরা পরিবেশ 'সংরক্ষণ' মানসিকতা সবার মধ্যে ছড়িয়ে দেবার জন্যে অক্লান্ত পরিশ্রম করে চলেছেন। এ ধরনের কাজ কেমন লাগছে জিগ্যেস করা হলে এঁরা সবাই বলেন, কাজের মধ্যে আনন্দ আছে কিন্তু একাজ তো কারুর একার নয়। তাই বলি কি, আসুন না আমরা সবাই হাতে হাত মিলিয়ে এই বলে এগিয়ে চলি। আগামী ২০০০ সালে পৃথিবীকে এক স্বর্গোদ্যানে পরিণত করি।

১০৪, ডায়মণ্ড হারবার রোড, কলিকাতা-৮

আবিষ্কারের গল্প

হ্যারিকেন জন্ম বৃত্তান্ত

শ্রীশচীনন্দন আঢ্য

হ্যারিকেন যা মানুষের নিত্য সঙ্গী, কবে যে তা আবিষ্কৃত হল, আর কি করেই যে ওটার নাম হ্যারিকেন হয়ে গেল, তা আমাদের জানা দরকার। হ্যারিকেনের মোটামুটি অর্থ হচ্ছে, "যে বাতি ঝড়েও নেভে না"। লণ্ঠনেরই উন্নত সংস্করণ হচ্ছে হ্যারিকেন।

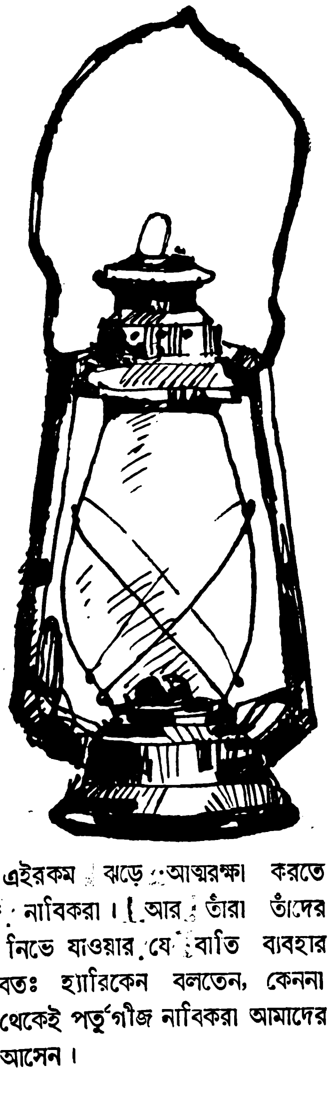

চতুর্দশ শতাব্দীর এক ভয়ঙ্কর দিনে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দ্বীপপুঞ্জে এক ভীষণ ঝঞ্ঝা নেমে আসে। যে ঝঞ্ঝা ইতিপূর্বে আর কখনও দেখা যায়নি। যার ক্যারিবিয়ান সমুদ্রের সাইক্লোন, টর্নেডো বা টাইফুনের সাথেও তুলনা হয়না। এই প্রলয়ঙ্কর ঝড়ের নাম সে দিনের বিশেষজ্ঞরা দিলেন —"হুরকান"।

আমরা ইংরাজীতে হ্যারিকেন নামে একখানা ছায়াছবিও দেখেছি। তাতে তুলনাহীন একটা প্রচণ্ড ঝড় দেখানো হয়েছিল। এইরকম ঝড়ে আত্মরক্ষা করতে ওস্তাদ ছিল পর্তুগীজ নাবিকরা। আর তাঁরা তাঁদের জাহাজে "হুড়কানে" না নিভে যাওয়ার যে বাতি ব্যবহার করতেন, তাকেও সম্ভবতঃ হ্যারিকেন বলতেন, কেননা ১৫০০ খ্রীষ্টিয় শতাব্দী থেকেই পর্তুগীজ নাবিকরা আমাদের দেশে ঐ ভাষাটা নিয়ে আসেন।

যাক হুরকানের দৌলতে আমরা যে পরিশোধিত বস্তুটি পাই, তা হচ্ছে আজকের হ্যারিকেন। আজকের এই পরিশোধিত রূপটি কিন্তু আগে ছিল না। বহুবার বহুরূপ পরিবর্তনের পর বর্তমানের পরিবর্তিত চেহারাটি দাঁড়ায়।

খৃস্টপূর্ব একশ শতাব্দীতে পশু শিং-এর গোড়ার দিকে গোটাকতক ছিদ্র করে তার ভিতরে দাহ্য পদার্থ রাখা হ'ত। যা তিমি বা শীল মাছের তেলে জ্বালানো হত। প্রায় হাজার বৎসরেরও ওপর বাতিটা ঐভাবে জ্বালানোর পদ্ধতিতে চলে আসছিল। তারপরে ১৪৯০ খৃষ্টাব্দে দা-ভিঞ্চি নামে একজন প্রখ্যাত মনীষী এর রূপ পরিবর্তন করেন এবং এতে লেন্স কাঁচ বসিয়ে হ্যারিকেনের উজ্জ্বলতা বাড়িয়ে দেন।

আবার ১৪০০ থেকে ১৭০০ খ্রীষ্টাব্দ অবধি এর নানা রূপান্তর ঘটে। উদ্ভাবনশীল মস্তিষ্কবানদের চেষ্টায়। ১৭৮৪ খ্রীষ্টাব্দে সুইস বৈজ্ঞানিক পদার্থবিদ্ Aim A'gand সম্পূর্ণ বিজ্ঞানভিত্তিক চিন্তায় হ্যারিকেনের রূপ দিলেন। অষ্টাদশ শতাব্দীতে পলতেটা কিনারা থেকে মধ্যস্থলে রাখার ব্যবস্থা হয়। কেউ কেউ বলেন তখনও নাকি কাঁচের চিমনি বের হয়নি। চিমনি হিসাবে ছিদ্র ছিদ্র ধাতু নির্মিত চিমনিই ব্যবহৃত হ'ত। দেখতে দেখতে আবিষ্কৃত হল বোতলের মত কাঁচ চিমনি পরবর্তীকালে তা হ্যারিকেনে শোভিত হয়েছে। আলোর কাঁপুনীও তদ্দিনে কমেছে, উজ্জ্বলতাও বেড়েছে।

আবার ১৮০০ অব্দে বাট্রাণ্ড-জি-কারসেল নামে এক বৈজ্ঞানিক আরো উন্নত ধরনের হ্যারিকেন আবিষ্কার করলেন। যাতে প্রতি নিয়ত তেল যোগান দিলে অবিরাম জ্বেলে রাখা যায়। এবং তাতে তেল হিসাবে ব্যবহৃত হতে থাকল পরিশোধিত কয়লার তেল। কয়লা তেল দিয়ে হ্যারিকেন জ্বালানোর পদ্ধতির পিছনে ছিল বৈজ্ঞানিক জেমস ইয়ং-এর অবদান।

খ্রীস্টিয় ১৮৫৯ শকে বৈজ্ঞানিক এডুইন-ড্রেক-হ্যারিকেনে খনিজ তেল ব্যবহারের কথা আবিষ্কার করেন। পরে আস্তে আস্তে মানুষের হাতে হাতে লোক লোকান্তরে হ্যারিকেন গমনাগমন আরম্ভ করল। বৈজ্ঞানিক হারা-করনিকরাও হ্যারিকেনকে জনপ্রিয় করতে যে অবদান রেখে গেছেন তা আমরা কোনকালের জন্য বিস্মৃত হব না।

আগে যা ঘটেছে

অদ্ভুত দর্শন একটা কৃষ্ট্যালের ভেতর মঙ্গল গ্রহের আশ্চর্য সব দৃশ্য দেখতে পেয়েছিলেন শার্লক হোমস ও এডোয়ার্ড চ্যালেঞ্জার। সেই থেকেই সব ঘটনার শুরু। কৃস্ট্যালের ভেতর দিয়ে সেইসব আশ্চর্য প্রাণীরা উড়ে এসে পৃথিবীতে এসে পড়ল। বিরাট চোঙার মতো চেহারা—তিন পায়ে হাঁটছে।

এই সময়ে টেলিগ্রাম এসে পৌঁছল হোম্‌সের কাছে। বৈদেশিক দপ্তর ও সরকারী তরফের অনুরোধ দেশের এই ভয়াবহ বিপদের সময় হোম্‌সকেই দায়িত্ব নিতে হবে মঙ্গলগ্রহীদের সঙ্গে মোকাবিলার।

মিসেস হাডসন কে গ্রামের বাড়ীতে পৌঁছে দিয়ে লণ্ডনে ফিরে আসছেন শার্লক হোম্‌স্। লণ্ডন শহর এখন জনশূন্য। শুধু শোঁ-শোঁ সাইরেনের আওয়াজ—আর মঙ্গলের দানব তাণ্ডব। হঠাৎই দেখা হয়ে গেল লণ্ডনের পথে আতঙ্কিত ইন্‌সপেক্টর হপকিন্সের সঙ্গে। হোম্‌সের হাতে সময় নেই। এখুনি হপ্‌কিন্স কে পাঠাতে হবে জরুরী চিঠি দিয়ে। কারণ জরুরী তথ্য পাওয়া গেছে মঙ্গল গ্রহীদের আচরণে। লাল ফুলগুলো মরে বাদামী হয়ে যাচ্ছে দেখেই সন্দেহ হয়েছিল হোমসের। তবে কি সত্যিই পৃথিবীকে বাঁচানো সম্ভব?

এদিকে বেশ কিছুদিন নিখোঁজ প্রফেসর চ্যালেঞ্জার হঠাৎ ঘরে ঢুকলেন ঝড়ের বেগে। হাতে একদম সময় নেই। জেসিকে নিরাপদে পৌঁছে দিতে হবে প্যারীতে। তারপর তিনি ধাতব দানবের সংগে সরাসরি মোকাবিলায় নামবেন। জাহাজঘাটায় পৌঁছে দেখলেন—অসম্ভব ব্যাপার। গোটা লণ্ডন শহর যেন জাহাজে এসে আশ্রয় নিয়েছে। কোনও মতে জেসিকে জাহাজে তুলে চ্যালেঞ্জার রয়ে গেলেন। আর সেই সময়েই শুরু হল মঙ্গল গ্রহাদের নীল বিদ্যুত বর্ষণ।

'ঐ তো! দূরে ভাসমান একটা সাদা স্টীমারের দিকে আঙুল তুলে দেখিয়ে প্রায় নাচতে নাচতে বললে খর্বকায় ক্যাপ্টেন—'দেখছেন না স্টীম তুলছে। এখুনি রওনা হবো। আপনি যাবেন? একটা জায়গা এখনো আছে—কতজনে এসে ঝুলোঝুলি করেছে। একজনের বেশী কাউকে তুলব না। ইনি আপনার সঙ্গে আছেন বুঝি? ইনিও যাবেন—জায়গা হয়ে যাবে। চলুন।"

তড়বড়ে হ্যারিস স্তব্ধ হতেই প্রফেসর বললেন—"দক্ষিণা?"

"আপনার কাছে দক্ষিণা?"

বিশ পাউণ্ড বার করে হ্যারিসের হাতে গুণে দিয়ে প্রফেসর বললেন কর্তৃত্বব্যঞ্জক স্বরে—'ইনি আমার স্ত্রী। নিতান্ত অবলা। এঁকে নিরাপদে প্যারিসে পৌঁছে দেওয়ার ভার তোমার। সেখানে আমার বন্ধু প্রফেসর পঁসির কাছে গেলেই উনি যা করবার করবেন।—জেসি, যাও ক্যাপ্টেন হ্যারিসের সঙ্গে।"

ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে জেসি বললে জর্জ তুমি?

আমার কাজ এখানে—প্যারিসে নয়। তোমাকে নিরাপদ জায়গায় না পাঠানো পর্যন্ত শান্তি পাচ্ছিলাম না।—যাও।"

দ্বিরুক্তি করার সাহস হল না জেসির। কোনোদিনই হয়নি। দুর্দান্ত স্বামীর প্রতিটি সিদ্ধান্ত মেনে নিয়েছে বিনা প্রতিবাদে—তাতে মঙ্গলই হয়েছে, প্রফেসর কখনো ভুল করেন না—জেসি তা জানেন।

চোখ মুছতে মুছতে গিয়ে উঠলেন চিমনিতে ধোঁয়া-ওঠা স্টীমারে। সঙ্গে সঙ্গে স্টীমার ছেড়ে গেল জেটি ছেড়ে। অনেকক্ষণ নিষ্পলকে সেদিকে চেয়ে রইলেন প্রফেসর। একটু একটু করে দিগন্তে মিলিয়ে গেল সাদা স্টীমার। ঘুরে দাঁড়ালেন প্রফেসর। দেখলেন, ঘোড়া এবং গাড়ী উধাও। সেই সঙ্গে বাকী মালপত্র!

চোর বদমাসের কাজ নিশ্চয়ই। আসবার পথেও তিনজন গুণ্ডার হাতে পড়েছিলেন। দুজনকে লাথি মেরে শুইয়ে দিয়েছিলেন। তৃতীয়জন ছুরি নিয়ে তেড়ে আসতেই কব্জি ধরে হাত খুলে দিয়ে ছুরি কেড়ে নিয়েছিলেন। তাই বুঝি তার তন্ময়তার সুযোগ নিয়ে নিঃশব্দে চুরি হয়ে গেল একমাত্র যান এবং বাহন—এই হট্টগোলের সময়ে যা অমূল্য।

রাগে হাত মুঠো পাকিয়ে দাঁত কিড়মিড় করলেন প্রফেসর। ঘন ঝোপের মত ভুরুর তলায় যেন স্ফুলিঙ্গ ছিটকে এল নীল চোখ থেকে। কিন্তু খামোকা রাগ করলে

তো চলবে না—পঞ্চাশ মাইল পথ পেরিয়ে ফিরে যেতে হবে লণ্ডনে।

তার আগে রাতটা সমুদ্রতীরেই কাটানো দরকার। এদিক ওদিক চাইলেন প্রফেসর। কিছুদূরে একটা টিলা। টিলার ওপর একটা প্রস্তর নিবাস। স্বাস্থ্যনিবাস নিশ্চয়। এখন দরজা জানলা বন্ধ।

টিলায় উঠতে আরম্ভ করলেন প্রফেসর। সূর্য ক্রমশঃ চলছে পশ্চিমে। প্রস্তর নিবাসে যখন পৌঁছলেন, তখন সূর্য দিগন্ত প্রায় ছুঁয়েছে। নিচের ভিড়ও অনেক বেড়েছে। বেড়েছে চীৎকার চেঁচামেচি। জাহাজ কম, কিন্তু যাত্রী বেশী। কাতারে কাতারে আরো লোক আসছে। যতদূর দু'চোখ যায়, মানুষ ছাড়া কিছু নেই।

অমানুষদের দেখা গেল ঠিক তখনই।

আচমকা আতংকে যেন ফেটে পড়ল পলাতক মানুষগুলো। পড়ি কি মরি করে দৌড়াতে লাগল সমুদ্রের তীর লক্ষ্য করে।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গে উল্টো দিক থেকে ভেসে এল ঝনাৎকার। ঝন্ ঝন্ ঝনাৎ ঝনাৎ…ঝন্ ঝন্ ঝনাৎ ঝনাৎ!

আসছে মেট্যাল মনস্টার! ধাতব দানব!

অচিরেই বড় বড় গাছগুলোর মাথা ছাড়িয়ে দেখা গেল প্রায় একশ' ফুট লম্বা অতিকায় অমানুষিকীকে। তিনটে সন্ধিযুক্ত ধাতুর ঠ্যাংয়ের ওপর অদ্ভুতভাবে ভারসাম্য বজায় রেখে প্রায় এক্সপ্রেস ট্রেনের গতিবেগে দৌড়ে আসছে মঙ্গলের অমঙ্গল। পিঠে বিরাট খাঁচায় ছটফট করছে নরদেহ! জীবন্ত খাদ্য।

পরমুহূর্তেই হাহাকার শোনা গেল বাঁ দিক থেকে। চোখ ফিরোলেন প্রফেসর। সেদিকেও আবির্ভূত হয়েছে একটা মনস্টার—দৈত্য!

আবার বুক চাপড়ানির মত করুণ কান্নাকাটিতে আকাশ যেন বিদীর্ণ হয়ে গেল পেছন দিকে। আবার ফিরলেন প্রফেসর। সেদিকেও লম্বা লম্বা ঠ্যাং ফেলে পর্বতপ্রমাণ চলন্ত টুলের মত এগিয়ে আসছে একটা দানব। তিনটে ঠ্যাংয়ের ওপর একটা ত্রিভুজের মত ফ্রেমের মধ্যে খাড়া বয়লার সদৃশ ডিম্বাকার আধার—মঙ্গলের প্রাণীর ককপিট। অনেকগুলো ধাতুর শুঁড় কিলবিল করছে চারদিক থেকে। দুটো শুঁড় একটা বাক্সর মত যন্ত্র ধরে রেখেছে সামনের দিকে।

নীল বিদ্যুতের যন্ত্র! আপন মনেই বললেন প্রফেসর।

সমুদ্রতীরে তখন মড়াকান্না উঠেছে। আতংকিত ধাবমানদের পদতলে যে কতজন পিস্ট হয়ে যাচ্ছে, কেউ তা ফিরেও দেখছে না। সবাই ছুটছে জলের দিকে। কিন্তু কিসের ভরসায়? জলযানগুলো বেগতিক দেখে নোঙর তুলে সরে যেতে শুরু করেছে বারদরিয়ার দিকে।

লক্ষ বৃংহিত ধ্বনিকে হার মানিয়ে দেওয়ার মত স্টীম সাইরেন বাজিয়ে তিন দানব সটান ধেয়ে গেল জলের দিকেই। পলায়মান জলযানদের পথরোধ করাই যেন উদ্দেশ্য। কিন্তু জলের ধারে পৌঁছেই বিড়ম্বনায় পড়েছে মনে হল। মঙ্গলে এরকম সমুদ্র নেই। জলাতংক থাকা স্বাভাবিক। তা সত্ত্বেও দানব তিনটে বুক জলে নেমে গেল হুড়মুড় করে।

আর ঠিক সেই সময়ে দেখা গেল ফুল স্পীডে তিন দানবের দিকে ধেয়ে আসছে দূরের যুদ্ধ জাহাজটা। আসছে শরীরী আতংকের মত। উদ্দেশ্য অতিশয় স্পষ্ট। নিরীহ জলযানদের রক্ষে করতেই হবে মঙ্গলের আতংকদের খপ্পর থেকে।

তাই গোধূলির রক্তাভায় দূর থেকেই দেখা গেল আগুনের ঝলক। পরক্ষণেই নির্ভুল লক্ষ্যে একটা বয়লার চুরমার হয়ে গেল গোলার ঘায়ে। হেলে পড়ল তিনটে ঠ্যাং। আবার শোনা গেল কামান নির্ঘোষ। আবার গোলা ধেয়ে এল দ্বিতীয় দানবটার দিকে—এবারও নির্ভুল লক্ষ্যে চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে গেল দ্বিতীয় বয়লার। তাল তাল বাষ্প ঠেলে উঠল ভেতর থেকে—সেই সঙ্গে সবুজ ধোঁয়া।

তৃতীয় দানবটা ততক্ষণে রণনীতি ধরে ফেলেছে। জাহাজ লক্ষ্য করে নীল বিদ্যুৎও নিক্ষেপ করেছে। কিন্তু হঠাৎ আক্রান্ত হওয়ার ফলে হতচকিত হওয়ার দরুনই বোধহয় লক্ষ্য ভ্রষ্ট হল। যুদ্ধ জাহাজের পাশ দিয়ে নীল বিদ্যুৎ গিয়ে জল স্পর্শ করতেই ছ্যাঁক করে একতাল বাষ্প ঠিকরে গেল শূন্যে।

তিন ঠেঙে দানব কিন্তু আর দাঁড়ালো না। পড়ি কি মরি করে জল থেকে উঠেই চম্পট দিল জঙ্গলের দিকে। মৃদু হাসি ফুটে উঠল চ্যালেঞ্জারের মুখে। পাল্টা মার তাহলে দিতে পেরেছে পৃথিবীর মানুষ। তাড়িয়ে দিতে পেরেছে অজেয় মঙ্গল-বিভীষিকাকে।

হাসি মিলিয়ে গেল পর মুহূর্তেই। আকাশ তখনো কালো হয়ে আসছে। ভোঁ বেজে উঠেছে যুদ্ধ জাহাজে। বিজয়োল্লাসের অট্টরোল শোনা যাচ্ছে সমুদ্রতীরে।

আর ঠিক তখনি জঙ্গলের মাথার ওপর দিয়ে নিঃশব্দে কিন্তু অকল্পনীয় দ্রুতবেগে ছিটকে এল একটা উড়ুক্কু যন্ত্রযান। সোজা ধেয়ে গেল সমুদ্রের ওপর দিয়ে যুদ্ধ

জাহাজের দিকে। চক্ষের পলক ফেলবার আগেই সাদা মত একটা বস্তু রকেটের মত উড়ন্ত পিরিচ থেকে ছুটে গেল যুদ্ধ জাহাজ লক্ষ্য করে এবং জাহাজ স্পর্শ করার সঙ্গে সঙ্গে বিস্ফোরিত হল চাপা শব্দে।

পুঞ্জ পুঞ্জ কালো ধোঁয়ায় ঢেকে গেল পুরো জাহাজ এবং আশপাশের জল। এক চক্কর ঘুরে এসে ধোঁয়ার মধ্যে দিয়েই নীল বিদ্যুৎ নিক্ষেপ করল উড়ন্ত চাকতি এবং কান ফাটানো শব্দে জাহাজটা ফেটে ছিটকে গেল শূন্যে এবং দিকে দিকে।

হা হয়ে এই দৃশ্য দেখল সাগরের পাড়ে দাঁড়ানো হতবাক মানুষেরা—দেখল ভাসমান জলযানের যাত্রীরা। উড়ন্ত চাকতি কিন্তু তখন প্রতিহিংসার নির্মম হয়ে উঠেছে। মুহুর্মুহু নীল বিদ্যুৎ ছুটে এল এক-একটা জলযান লক্ষ্য করে। নিমেষে নিমেষে অগ্নি দেবতা নৃত্য করে উঠল এক-একটা জলযানের ওপর। একী নিঠুরতা! একী উন্মত্ততা!

কিন্তু জিঘাংসার তখনো বাকী! প্রফেসর চ্যালেঞ্জারের বিস্ফারিত চোখের সামনেই ঘটল সেই কাণ্ড। সবকটা জলযানে আগুন ধরিয়ে দিয়ে উড়ন্ত চাকতি সটান ছুটে এল সমুদ্রতীরে এবং বেশ খানিকটা নেমে এসে আতংকে আধমরা মানুষগুলোর মাথার ওপর দিয়ে উড়ে গেল উল্কার মত প্রচণ্ড বেগে।

সেই সঙ্গে পেছন থেকে বেরিয়ে এল তাল তাল কালো ধোঁয়া। যেন প্রকাণ্ড পিচকিরি দিয়ে কালো ধোঁয়াকে পাম্প করে ছড়িয়ে দেওয়া হল অসহায় মানুষগুলোর ওপর।

ধোঁয়া ছড়িয়ে দিয়েই সাঁ করে ওপরে উঠে গিয়ে, যেদিক থেকে এসেছিল, সেই দিকেই মিলিয়ে গেল উড়ন্ত চাকতি। ফিরেও দেখল না ধ্বংস লীলা কি পর্যায়ে পৌঁছেছে।

দেখলেন কেবল প্রফেসর চ্যালেঞ্জার। ধোঁয়া সরে যাওয়ার পর দেখলেন, কাতারে কাতারে মানুষ লুটিয়ে পড়েছে বালির ওপর। নিষ্প্রাণ। নিস্পন্দ।

তরল গ্যাসের মতই ভারী ধোঁয়া গড়িয়ে যাচ্ছে বালির ওপর দিয়ে—ওপরে উঠছে না পৃথিবীর সব ধোঁয়ার মত। তাই টিলার ওপর ছিলেন বলে প্রাণে বেঁচে গেলেন প্রফেসর চ্যালেঞ্জার।

ক্রমশঃ

ছাত্র-ছাত্রীদের অপরিহার্য বই

সম্পূর্ণ পরিমার্জিত তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হল

অধ্যাপক ক্ষেত্রপ্রসাদ সেনশর্মার

উচ্চ মাধ্যমিক রসায়ন

প্রথম খণ্ড : একাদশ শ্রেণী

⊛ প্রচুর গাণিতিক উদাহরণযোগে, নানা রাসায়নিক গণনা সহজবোধ্যভাবে করে দেওয়া আছে। ⊛ অবজেক্টিভ ও সাবজেকটিভ উভয় ধরনেরই প্রশ্নের সংকলন (এবং গ্রন্থে তার উত্তর) করা হয়েছে। ⊛ ছাত্রছাত্রীদের প্রশ্নোত্তরের সাধারণ ত্রুটি ও তার সংশোধন এবং কিছু আদর্শ প্রশ্নোত্তর দিয়ে একটি বিশেষ উপযোগী অধ্যায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ⊛ উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের আদর্শ প্রশ্নগুলিকে গুরুত্ব দিয়ে, কিছু উত্তর পৃথকভাবে করা হয়েছে। ⊛ প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা—জয়েন্ট এন্ট্রান্স, আই. আই. টি—প্রভৃতি পরীক্ষার প্রশ্নগুলিকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

দি পাইওনীয়ার পাবলিকেশনস ॥ ৮/১এ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলি-৭৩

শুক্র গ্রহের বায়ুমণ্ডল

শ্রী বিজয় বল

আমাদের এই পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল আমাদের কাছে বেশ পরিচিত। অক্সিজেন, নাইট্রোজেন এবং অন্যান্য গ্যাসে পূর্ণ বায়ুমণ্ডলের কল্যাণে পৃথিবী তার বিরাট জীবজগৎকে নিয়ে বসবাস করছে। বায়ুমণ্ডলের গতিপ্রকৃতি এবং অবস্থানের উপর নির্ভর করে মানুষ এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তের মানুষের সঙ্গে যোগাযোগের ব্যবস্থা করে নিচ্ছে। বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তিবিদ্যার দিন দিন যত উন্নতি হচ্ছে, এই বায়ুমণ্ডলকে আরও ততো বেশী বেশী করে মানুষের প্রয়োজনীয় বলে মনে হচ্ছে।

পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল সম্পর্কে যখন বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলেছে, বিভিন্ন ভাবে তাকে কাজে লাগাবার চেষ্টা চলেছে, তখন এই সৌরজগৎ-এর অন্যান্য গ্রহদের বায়ুমণ্ডল সম্পর্কে খবরাখবর জানার আগ্রহও মানুষের কম নয়। আজকের যুগের মানুষ কেন, আমাদের পূর্ব পুরুষরাও বিভিন্ন গ্রহ নক্ষত্রের গতিপ্রকৃতি লক্ষ্য করেছেন, তা নিয়ে অনেক ভাবনা চিন্তা করেছেন, এমন কি গ্রহ-নক্ষত্রের গতিপ্রকৃতির সঙ্গে এই পৃথিবীর আবহাওয়ার পরিবর্তন এবং এই পৃথিবীর মানুষের জীবনযাত্রার পরিবর্তন লক্ষ্য করার চেষ্টাও করেছেন। কিন্তু এখানে আপাততঃ শুক্র গ্রহের বায়ুমণ্ডল সম্পর্কেই আলোচনা করবো।

মেঘমুক্ত আকাশের দিকে তাকালে অসংখ্য গ্রহ নক্ষত্রের মাঝে সবচেয়ে জ্বল-জ্বলে হয়ে যে গ্রহটি ধরা দেয়, ওরই নাম শুক্র গ্রহ। যাদের গ্রহ নক্ষত্রের গতিবিধি লক্ষ্য রাখার উপর ঝোঁক আছে তারা অনেকেই রাতে কেন দিনের বেলায়ও অনেক সময় সুযোগ করে শুক্র গ্রহকে দেখেছেন। ইতিহাসের পাতা খুললেও এই গ্রহকে নিয়ে অনেক অনেক কিংবদন্তীর খোঁজ মেলে। আগেই বলে রাখি যদিও আগেরকার মানুষরা খালি চোখেই গ্রহ-নক্ষত্রের পর্যবেক্ষণ করতো কিন্তু টেলিস্কোপ আবিষ্কার হবার পর থেকে এই পর্যবেক্ষণের কাজ অনেক সঠিক এবং দ্রুত হয় এবং অবশেষে মহাকাশ অভিযান শুরু হবার পর থেকেই এদের সম্পর্কে আরও অনেক অনেক বেশী তথ্য মানুষের হাতে পৌঁছায়। এই পৃথিবীর মাটি থেকে শুক্র গ্রহের দিকে প্রথম যাত্রা শুরু হয় ১৯৬১ সালের ১২ই ফেব্রুয়ারী। রাশিয়ার মহাকাশ যান ভেরেনা-১ শুক্র গ্রহের দিকে ৭৫ লক্ষ কিলোমিটার পথ চলার পর কিছু কিছু তথ্য পাঠাতে পাঠাতে হঠাৎ পৃথিবীর সঙ্গে তার যোগাযোগ ছিন্ন হয়ে যায়। এর পর ১৯৬২ সালের ২৬শে অগাস্ট যাত্রা শুরু

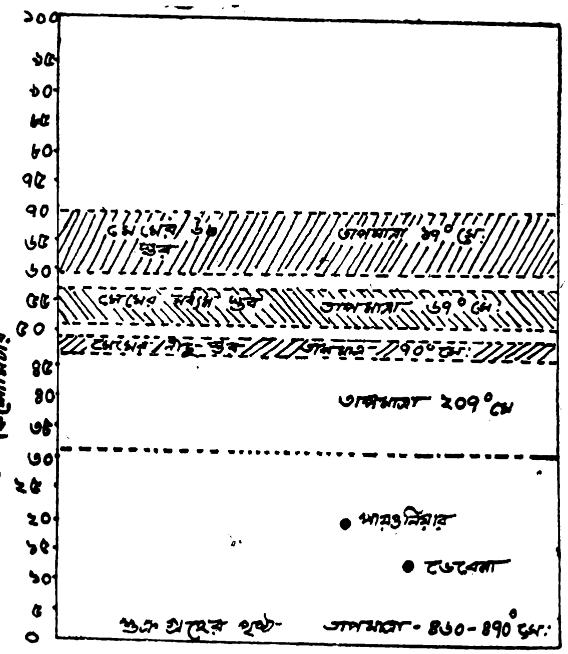

করে আমেরিকার মেরিনার ২। মেরিনার-২ মহাকাশ যানটি শুক্র গ্রহের বেশ কিছুটা দূর থেকে উড়ে যাবার সময় কিছু কিছু তথ্য পৃথিবীকে পাঠায়। এরপর একের পর এক মহাকাশ যাত্রা শুক্র গ্রহের দিকে পাড়ি দেয়। আজ পর্যন্ত পর পর ১৭ বার পৃথিবীর মাটি থেকে শুক্রগ্রহের দিকে অভিযান চলে। এরপর আসি এইসব অভিযান থেকে পাওয়া শুক্রগ্রহের বায়ুমণ্ডল সম্পর্কে সংগৃহীত তথ্যের কথায়।

প্রথমেই বলে রাখি, যদিও শুক্র আমাদের সবচেয়ে কাছের গ্রহ এবং এর ওজন ও ব্যাসার্ধ পৃথিবীর ওজন এবং ব্যাসার্ধের বেশ কাছাকাছি, কিন্তু বায়ুমণ্ডলের অবস্থা এবং তার চরিত্র পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের থেকে একদম আলাদা। সূর্যের গ্রহদের মধ্যে শুক্রই সবচেয়ে কাছের গ্রহ যার মধ্যে বায়ুমণ্ডল আছে। পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের প্রায় একশ' গুণ ভারী শুক্রের এই বায়ুমণ্ডল প্রায় সবটাই (৯৬.৬ শতাংশ) কার্বন ডাই-অক্সাইডে ভরা। আর রয়েছে অল্প পরিমাণে নাইট্রোজেন অণু (প্রায় ৩.২

শতাংশ)। এছাড়া খুবই সামান্য পরিমাণে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড, হাইড্রোফ্লোরিক অ্যাসিড, কার্বন মনো-অক্সাইড, জলীয় বাষ্প প্রভৃতির সন্ধান মেলে। অক্সিজেন প্রায় নেই বললেই চলে। তবে আরগন, নিয়ন প্রভৃতি নিষ্ক্রিয় গ্যাস পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের তুলনায় প্রায় একশ' গুণ বেশী এখানে পাওয়া যায়। এ প্রসঙ্গে একটা কথা বলা বিশেষ প্রয়োজন যে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের সৃষ্টির প্রথম দিকেই কার্বন ডাই-অক্সাইডের অধিকাংশই সমুদ্রের জলে শোষিত হয়ে যায় এবং বিভিন্ন কার্বনেট তৈরী করে এবং কিছু কার্বন ডাই-অক্সাইড লেগে যায় সালোকসংশ্লেষের কাজে। কিন্তু শুক্র গ্রহের বেলায় ছবিটা একটু অন্য রকম। সূর্য থেকে যে পরিমাণ শক্তি প্রতি মুহূর্তে শুক্রের গায়ে আছড়ে পড়ছে তার একটা বিরাট অংশই শুক্রের পৃষ্ঠ থেকে সত্তর কিলোমিটার উচ্চতা পর্যন্ত বিস্তৃত বায়ুমণ্ডলের কার্বন ডাই অক্সাইডের বিভিন্ন স্তরে প্রতিফলিত হয়ে শেষ পর্যন্ত বায়ুমণ্ডলের মধ্যেই আটকা পড়ে যাচ্ছে। ফলে শুক্র গ্রহের পৃষ্ঠের তাপমাত্রা কখোনই ৪৬০°C-৪৭০°C এর নীচে নেমে আসতে পারছে না। বায়ুমণ্ডলে যে সামান্য পরিমাণ জলীয় বাষ্প আছে তাও এই প্রচণ্ড তাপে ঘনীভূত হওয়া সম্ভব হয়ে উঠছে না। সামান্য পরিমাণে যে জলীয়বাষ্প আছে তা বায়ুমণ্ডলের উপরিভাগে সালফার ডাই-অক্সাইডের সঙ্গে বিক্রিয়া করে ফোঁটা ফোঁটা সালফিউরিক অ্যাসিড তৈরী করছে। এসব অবস্থায় এটা ভাবা নিশ্চয়ই অমূলক নয় যে অবস্থার বিশেষ কোন আশ্চর্য রকম পরিবর্তন না ঘটলে শুক্রগ্রহে প্রাণের সৃষ্টি সম্ভব নয়।

অবশেষে গত ১৯৭৮ সালের ডিসেম্বর মাসে আমেরিকার মহাকাশ যান পাইওনিয়ার ভেনাস-২ এবং রাশিয়ার মহাকাশ যান ভেরোনা-১১ এবং ভেরোনা-১২ শুক্র গ্রহের বায়ুমণ্ডলের একেবারে ভিতরে প্রবেশ করে যে তথ্য সংগ্রহ করেছে সে সম্পর্কে কিছু বলছি।

শুক্রগ্রহের পৃষ্ঠ থেকে প্রায় ৭০ কিলোমিটার উপরে অবস্থিত ঘন মেঘের চূড়া। এই মেঘ প্রধানতঃ তিনটি স্তরে বিভক্ত। উপরের স্তরটি থেকে ৫৮ কিলোমিটার উচ্চতা থেকে ৭০ কিলোমিটার উচ্চতা পর্যন্ত বিস্তৃত। এক সেণ্টিমিটারের দশ হাজার ভাগের একভাগ দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট অতিসূক্ষ্ম সালফিউরিক অ্যাসিডের ফোঁটা দিয়ে তৈরী এই স্তর। এর তাপমাত্রা ১৭° থেকে ২০° সেণ্টিগ্রেডের মধ্যে।

উপরের স্তরের ঠিক নীচে থাকে দ্বিতীয় স্তর বা মধ্যম স্তর। পৃষ্ঠ থেকে ৫১ কিলোমিটার থেকে ৫৬ কিলোমিটার উচ্চতা পর্যন্ত বিস্তৃত এই স্তর। অতি সূক্ষ্ম সালফিউরিক অ্যাসিডের কণা এই স্তরেও আছে। এছাড়া সালফিউরিক অ্যাসিডের কণা থেকে কিছু বড় সালফারের কণার সন্ধান এই স্তরে মেলে। সালফারের কণা উপস্থিতির জন্য এই স্তরের রঙ অনেকটা পাকা লেবুর মত হলদে আভা দেখায়। এই স্তরে তাপমাত্রা প্রায় ৬৭° সেণ্টিগ্রেড্।

সবচেয়ে নীচে যে স্তরটি সেটি দুই কিলোমিটারের মত মোটা। এর তাপমাত্রা ৭০° সে.। ছোট বড় কঠিন সালফারের কণা এই স্তরে পাওয়া যায়। এই স্তরের নীচে পৃষ্ঠ থেকে ৩১ কি. মি. উচ্চতা পর্যন্ত কঠিন এবং তরল সালফারের সন্ধান মেলে কিন্তু এর নীচে সালফার বা অন্যান্য মৌলকণার সন্ধান পাওয়া যায় না। শুক্রগ্রহের মেঘ এত ঘন যে পাইওনিয়ার বা ভেরোনা যখন পৃষ্ঠের কাছাকাছি আসে তখন আর সেখান থেকে সূর্যকে দেখতে পাওয়া যায় না।

পৃথিবীর মাটি থেকে শুক্রগ্রহের দিকে আরও মহাকাশ যান যাবার প্রস্তুতি চলেছে। ভবিষ্যতে আরও বহু মূল্যবান তথ্য সেখান থেকে নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে এই আশা রেখে আপাততঃ এখানেই শেষ করছি।

পোঃ আগড়পাড়া, ২৪ পরগণা

ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত মাসিক বিজ্ঞান পত্রিকা

‘বিজ্ঞান বিচিত্রা’র বিশেষ সংখ্যা

গোপাল ভট্টাচার্য স্মরণ সংখ্যা রূপে প্রকাশিত হয়েছে ॥ দাম – ৩·০০

প্রাপ্তিস্থান

অবলা প্রকাশনী	বুকস্ এণ্ড নিউজ	রসরাজ
যোগেন্দ্রনগর আগরতলা	প্রতাপ স্মৃতি কর্ণার	শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
	কলেজ স্ট্রীট	কলিকাতা

আঠারো কোটি বছরেও যে-দাঁত পড়েনি

অমিতাভ সেন

হ্যাঁ, এই ছবির দাঁতগুলোর বয়স ১৮ কোটি বছর। এখনো দিব্যি ধারালো, ঝকঝক করছে। তবে এটাকে এখন শুধু দাঁত বলা চলবে না, বলতে হবে দাঁতের জীবাশ্ম বা পাথর হয়ে যাওয়া দাঁত। ইংরাজীতে দাঁতের ফসিল্।

মানুষের ইতিহাস জানার জন্য আছে মানুষেরই লেখা বিবরণ। না, তার সবটাই ছাপার অক্ষরে নয়, এমনকি কালি দিয়ে কাগজের ওপরেও লেখা নয়। কাগজ আসার আগে ব্যবহার হয়েছে ভূর্জপত্র, বাকলপত্র, চামড়া, বস্ত্রখণ্ড, তাম্রপত্র ও শিলাখণ্ড ইত্যাদি। আর বর্ণমালার আগের যুগের খবরাখবর সংগ্রহ করার জন্যে আমরা সাহায্য নিয়েছি চিত্রকলা, ভাস্কর্য, স্থাপত্য, পোশাক ও মানুষের ব্যবহার করা নানা রকমের সামগ্রীর ও অস্ত্রশস্ত্রের নিদর্শনের। মানুষের হাতে গড়া জিনিসই মূলতঃ ইতিহাসের উপাদান। কিন্তু তাহলে উদ্ভিদ ও প্রাণিজগতের ইতিহাস আমরা কি করে সংগ্রহ করলাম? সেই যে বিকট চেহারার অথচ তৃণভোজী সব ডাইনোসরদের গল্প শুনি আমরা বা ছবি দেখি—সে কি শুধুই কল্পনা? তখন তো মানুষই ছিল না পৃথিবীতে। না, তা নয়। বর্তমানে লোপ পেয়ে গেছে এরকম আদ্যি-

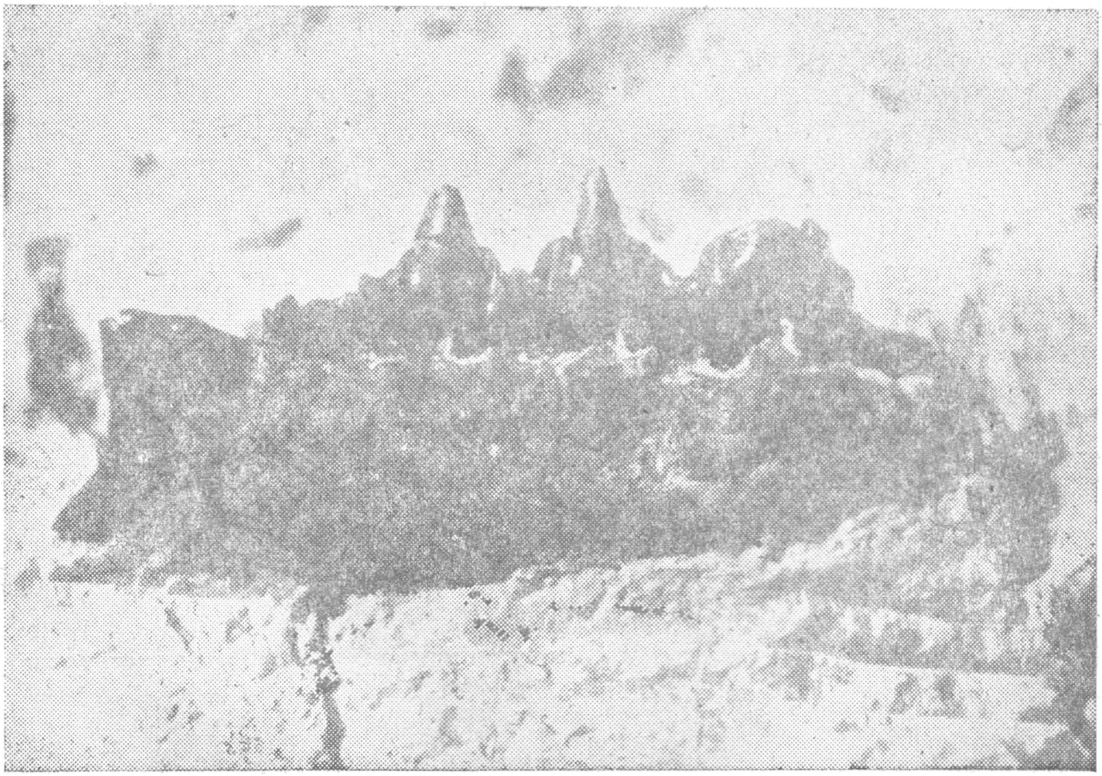

১৮ কোটি বছরের পুরানো জীবাশ্ম

কালের গাছপালা ও জীবজন্তুর খবরাখবর আমরা জীবাশ্ম থেকে যোগাড় করেছি।

জীবাশ্ম হল অতীতের জৈব বস্তুর চিহ্ন, ছাপ বা অবশিষ্ট। প্রাচীন জীবদেহ অনেক রকম ভাবেই জীবাশ্ম-রূপে টিকে থাকতে পারে। যেমন, প্রিমিনারালাইজেশন (Premineralisation)-এর দরুন জৈব বস্তুর কঠিন অংশের ছিদ্রগুলির মধ্যে সিলিকা, পাইরাইট, ক্যালসাইট প্রভৃতি কিছু কিছু খনিজ প্রবেশ কোরে যে জীবাশ্ম তৈরি হয়, সেটি খনিজ ও জৈববস্তুর মিশ্রণ। কখনো আবার জীবদেহ বা জৈব বস্তুর কঠিন অংশগুলি কালক্রমে দ্রবীভূত হয়ে যায় কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সেই শূন্যস্থান পূরণ করে চলে মাটির খনিজ পদার্থ। বিশেষ এবং মূল বস্তুটির আকৃতির অবিকল একটি ছাঁচ গড়ে ওঠে। আবার এও দেখা যায় যে মূল জৈব বস্তুটি সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে গেছে কিন্তু তার ছাপ রয়ে গেছে পাথরের গায়ে। তবে সবচেয়ে দুর্লভ ও বিস্ময়কর হল জীবদেহ বা তার অংশ বিশেষ যখন জীবাশ্ম-রূপে পরোপুরি সংরক্ষিত হয়। ইতিপূর্বে সাইবেরিয়া অঞ্চলে হাতিদের পূর্বপুরুষ ম্যামথের এরকম জীবাশ্ম আবিষ্কৃত হয়েছে।

সম্প্রতি ন্যাশানাল জিওগ্রাফিক সোসাইটির আর্থিক সহযোগিতায় হারভার্ড ইউনিভর্সিটির বিজ্ঞানীরা আরিজোনার নাভাজো উপজাতির ইণ্ডিয়ান অধ্যুষিত একটি অঞ্চলে পত্নতাত্ত্বিক অভিযান চালান। অনুসন্ধানের সময় মাটি খুঁড়ে হঠাৎ তাঁরা একটি দাঁতওলা জন্তুর চোয়ালের জীবাশ্ম পান। পরীক্ষা করে জানা গেছে এই জীবাশ্মটির বয়স ১৮ কোটি বছর। জন্তুটি যে আকারে খুব বড় নয় তা নয়। ইঁদুরের মতো এবং স্তন্যপায়ী। অভিযানের নেতা ডক্টর ফারিশ জেনকিন্স জানিয়েছেন যে, এই আবিষ্কারের ফলে প্রথম প্রমাণ পাওয়া গেল যে উত্তর আমেরিকায় এতকাল আগেও স্তন্যপায়ী প্রাণীরা বাস করত। ডক্টর জেনকিন্স আরো বলেছেন যে, এই আবিষ্কার স্তন্যপায়ী প্রাণীদের জগত সম্বন্ধে গবেষকদের সামনে একবারে নতুন একটা দিগন্ত খুলে দিয়েছে। স্তন পায়ী প্রাণীদের বিবর্তনের যে-ইতিহাস আমরা এতদিন জানতাম তা আরো সমৃদ্ধ হল এখন। ১৮ কোটি বছর আগে স্তন্যপায়ীদের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের জীব ছিল না বলেই এতদিন বিজ্ঞানীদের ধারণা ছিল। এই ছোট্ট স্তন্যপায়ী প্রাণীটির দাঁতসুদ্ধ চোয়ালের ফসিল্ দেখে বিজ্ঞানীরা এখন আবার নতুন করে ভাবতে বসেছেন।

৮/১ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩

মাছের জল পান

হীরক দাশ

মাছ জলে থাকে। কিন্তু মাছ কি আমাদের মতো জল খায়? খেলে, দিনে কতটা পরিমাণে খায়? না কি সর্বক্ষণই গদ্‌গদ্ করে জল খায়? তবে তা বুঝবার আগে তোমাদের 'অসমোসিস্' সম্বন্ধে একটু ধারণা থাকা প্রয়োজন।

সূক্ষ্ম পর্দা বিশেষের মধ্য দিয়ে জল বা অন্য কোন দ্রাবক তরল পদার্থের যে গতি লক্ষিত হয়, তাকেই বলে 'অসমোসিস্' (osmosis)। দুটো ভিন্ন গাঢ়ত্বের দ্রবণকে যদি এই বিশেষ পর্দা দ্বারা বিচ্ছিন্ন করে রাখা যায়, তবে স্বতঃস্ফূর্তভাবে দ্রাবক অণুগুলো পাতলা দ্রবণ থেকে গাঢ় দ্রবণের দিকে চলে গিয়ে উভয়ের ঘনত্ব সমান করতে চায়। এই ঘটনাকে বলা হয় অসমোসিস্। এখানে উল্লেখ্য, দ্রাবক তরল পদার্থ এই পর্দার মধ্যে দিয়ে নিঃশর্ত হয় কিন্তু দ্রাব্য পদার্থটি আটকে যায়।

মাছদের সমস্ত শরীরে ঘটে এই অসমোসিস্। জাল, চামড়া, ইত্যাদি বাহিরাবরণ, মুখ গহ্বরের আচ্ছাদন, কানকো এবং মাছের অন্যান্য দেহাংশ জলকে তাদের মধ্যে দিয়ে যেতে দেয়, কিন্তু নুন বা অন্য কোন বস্তুর পথ আটকে দেয়। মিষ্টি জল অর্থাৎ নদী, পুকুরের জল হয় পরিষ্কার। এতে লবণ বা অন্য কোন দ্রবীভূত পদার্থ বিশেষ থাকে না। পরিষ্কার এই জলের মাছদের রক্ত আর টিসুর তরল পদার্থে নুন ও অন্যান্য প্রোটিন বস্তু থাকে বিস্তর পরিমাণে। তাই মিষ্টি জলের মাছদের শরীরের মধ্যে বাইরের প্রচুর জল ঢোকে ওই দেহাংশগুলোর মাধ্যমে। কারণ তোমরা জেনেছো, অসমোসিসের প্রভাবে জল বা কোন তরল দ্রাবক অধিক ঘনত্বের দ্রবের দিকে প্রভাবিত হয়। এই মাছদের শরীরে অতিরিক্ত জল বের করে দেওয়ার নিষ্ক্রমণ পথও আছে। তা না থাকলে এরা ফুলে ফেঁপেই মারা যেত। এই জন্য মিষ্টি জলের মাছদের জল খাওয়ার কোন প্রয়োজন হয় না এবং এরা জল কখনও খায় না।

কিন্তু সামুদ্রিক মাছদের ক্ষেত্রে ঘটে একেবারে উল্টো ঘটনা। সমুদ্রের জলে নুনের পরিমাণ বেশি এবং এই জলে নুন যে পরিমাণে থাকে তার থেকে অনেক কম পরিমাণে থাকে সামুদ্রিক মাছদের রক্ত আর টিসুর তরল পদার্থে। তাই ওই দেহাংশগুলোর মাধ্যমে এদের শরীর থেকে সব সময় জল বাইরে বের হতে থাকে। সেই জন্য এরা অনবরত জল খেয়েই চলে—নইলে সমুদ্রই এদের শুকিয়ে মেরে ফেলতো!

১৯/আর, সেলিমপুর রোড, পোঃ—ঢাকুরিয়া, কলিকাতা-৩১

বিজ্ঞানভিত্তিক গল্প

অতিথি

সুধাংশু পাত্র

শীতের সকাল। কুয়াশার পাতলা আস্তরণ ভেদ করে সবে মাত্র এখানে ওখানে ছড়িয়ে পড়েছে ছোপ ছোপ হলদে রোদ্দুর। শিশির ভেজা সোনা ধানের শীষ নুয়ে পড়েছে আলের উপর। ডাগর ডাগর চোখে বিশ্বগ্রাসী ক্ষুধা নিয়ে, জল খাবারের পুঁটলি মাথায় ধানের শীষ মাড়াতে মাড়াতে দক্ষিণ মাঠের পানে এগিয়ে চলেছে রাখী। সেখানে তার আব্বা আবদুল ধান কাটছে। আল থেকে একটু দূরে একটা বাবলা গাছ। শীতে শীর্ণ দেহ। তার জীর্ণ পাতার আড়ালে সাদা সাদা সূচের বিছানায় রোদ পোহাচ্ছিল কয়েকটা বক। কী ভেবে পুঁটলিটা আলের উপর নামিয়ে রেখে এক টুকরা কাঁকড়া মাটি ভেঙ্গে নিয়ে রাখী এগিয়ে গেল সেদিকে। বিঘে পাঁচেক দূরে আবদুল কাটছিল ধান। রাখীকে বাঁক পথ ধরতে দেখে ডাক দিল—অ্যাই রাখী, যাসনে বলছি। সিধে চলে আয়।

—যাই আব্বা!

রাখী কিন্তু আবদুলের দিকে যাওয়ার কোন লক্ষণই প্রকাশ করল না। মাথায় কোঁকড়া কোঁকড়া চুলে একবার ঢেউ তুলে এবং শিশিরে ভেজা তার আধময়লা ফ্রকটার তলদেশ এক হাতে একটু নিংড়ে নিয়ে চলে গেল সেই বাবলা গাছটার দিকে। কাছে যেতেই থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল রাখী। গলায় বিস্ময় ছড়াতে ছড়াতে চিৎকার করে উঠল।

—উই, উই, আব্বা! দেখেছো ওইখানে?

কাস্তে হাতে আবদুল তক্ষুনি ছুটে এল। ভাবল আলের উপর চকুর বেঁধে রোদ পোহাচ্ছে কোন কেউটে। অথবা বাবলা তলায় জলা জমিটার ঝিরঝিরে জলে শোল মাছ দেখেছে রাখী। কিন্তু কাছাকাছি হতে দেখল, একটা বালুহাঁস ধানের ছাদে আটকে গিয়ে ছটপট করছে। ধূসর গায়ে গোলাপী আভা, ঠোঁটটা সিঁদুরের মত টকটকে লাল। আবদুলের চোখ দুটো চক্‌চক্ করে উঠল। মুহূর্ত মাত্র বিলম্ব না করে কাস্তে হাতে ঝাঁপিয়ে পড়ল হাঁসের উপর। আর ঠিক তক্ষুনি চিৎকার করে উঠল রাখী—তুমি ওকে মেরোনা আব্বা, আমি পালবো।

মেয়ের নিবিড় কালো চোখের দিকে তাকিয়ে আবদুলের মনটা কেমন করে উঠল। ভাবল, হাঁসটাকে এখন না মেরে পরে মারলেও চলবে। কয়েক গাছা শিশির ভেজা ধান গাছের শুকনো খড় দিয়ে হাঁসের পা দুটিকে

ভালভাবে বেঁধে ধরিয়ে দিল মেয়ের হাতে।

মাঠের মোটা আলের উপর হাঁসটাকে কোলে করে বসেছিল রাখী। আবদুল তখনও মনের সুখে তেঁতুলের আচার দিয়ে ল্যাল লাল পান্তা ভাত গিলছিল। ঠিক সেই সময় মাঠের ধান দেখে ফিরছিলেন অমৃত মাস্টার। রাখীর কোলে নধর হাঁসটিকে দেখে একগাল হেসে জিজ্ঞাসা করলেন—ওকে কোথায় পেলিরে আবদুল?

ঢোঁক গিলে মোলায়েম হাসি হেসে আবদুল বলল—আজ পেরভাতটা ভালই হয়েছিল মাস্টার চাচা! মাঠের মধ্যিখানে রাখীই পেয়ে গেল উটিকে। এট্টু বসেন চাচা, দুটো কথা কই।

দ্বিরুক্তি না করেই অমৃত মাস্টার বসে পড়লেন আবদুলের পাশে। আবদুল মুখটা ব্যাজার করে আপসোসের সুরে বলল—উদের উই সময়টা দেখা যায় বটি, কিন্তুক ধরা যায় না। একগাল হেসে বললেন অমৃত মাস্টার—ওরা আমাদের শীতের অতিথি রে!—

অতিথি! সি আবার ক্যামন? জিজ্ঞাসা করল আবদুল।

যেন আপন মনেই বলে গেলেন অমৃত মাস্টার—হাজার হাজার মাইল উত্তরে শীতের দেশগুলিতে ওদের বাস। হিমালয়, সাইবেরিয়া, তুন্দ্রা অঞ্চল, এমনকি উত্তর মেরু থেকেও ওদের কেউ কেউ ছুটে আসে আমাদের দেশে। দেশ তাদের এ সময়টা বরফে বরফে ঢাকা পড়ে। সব সময় ঝরে তুষার। আকাশে মাত্র কয়েক ঘণ্টার বেশি সূর্য থাকে না। তখন ঘর ছাড়তে ওরা বাধ্য হয়। বড় অদ্ভুত ওদের জীবন রে।

একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করলেন অমৃত মাস্টার। আবদুলও বিস্মিত বড় কম হল না। সে জানে না কোথায় সাইবেরিয়া আর কোথায় তুন্দ্রা! তবু ঐ হাজার হাজার মাইল কথাটা শুনে চোখ দুটো তার পাথরের মত শক্ত হয়ে গেল। অস্ফুটস্বরে জিজ্ঞাসা করল—ওরা কত দূরে যাবে?

—সমুদ্রের উপকূলে অথবা নির্জন কোন দ্বীপে। কয়েকটা মাস নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে কাটাবে। ডিম দেবে। একদিন ডিম ফুটে বেরুবে বাচ্চারা। তারপর বাচ্চারা সবল হলে গরম পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই সন্তান-সন্ততিদের নিয়ে আবার পাড়ি দেবে দেশের পানে।

—পথ ওরা হারাবে না?

—না আবদুল। ওদের ঘ্রাণ শক্তি বড় তীব্র এবং চোখে দূরবীনের দৃষ্টি। আরও আশ্চর্য, প্রতি বছর তারা একই পথে আসে আবার একই পথে ফিরে যায়।

অল্পক্ষণ মৌন থাকার পর আবদুল জিজ্ঞাসা করল—উরা পথে খায় কী মাস্টার চাচা?

একটু চিন্তা করে বললেন অমৃত মাস্টার—ব্যাঙকে দেখেছিস তো, সারা শীতকালটা গর্তে কেবল ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে কাটায়?

আবদুল মাথা নেড়ে সম্মতি প্রকাশ করল। অমৃত মাস্টার বললেন—বর্ষাকালে ওদের গায়ে যে চর্বি জমে সেই চর্বিই ওদের শীতকালে যোগায় জীবনরক্ষার উপাদান। তাই শীতের সময় ব্যাঙদের না খেলেও চলে যায়। তেমনই ঐ হাঁসেদের গায়েও জমে চর্বি। না খেয়েও একটানা বেশ কিছুদিন উড়তে পারে আকাশে। তারপর একটু বিশ্রামের জন্য এবং খাবার সংগ্রহের জন্য মাঝে মাঝে রাতের অন্ধকারে নেমে পড়ে জলার ধারে। সেই সময় দু একটা দলভ্রষ্ট হয়ে পড়ে অথবা অসুস্থ যারা, তারা থেকে যায়। আর হাঁ করে আকাশের পানে তাকিয়ে থাকে পরবর্তী দলের জন্য। তোমার এই হাঁসটি দলভ্রষ্ট অথবা অসুস্থদের মধ্যে একটি। তবে যারা থেকে যায়, তারা মানুষের হাত থেকে খুব কমই রক্ষা পায়। আবদুল কী যেন ভাবল। তারপর বলল—বেশ হয়। কথায় বলে, দুঃখু হোক দেশেই থাকবি। তা এতদূর থেকে ছুটে আসার কী দরকার রে বাপু?

মৃদু হেসে অমৃত মাস্টার বললেন—ঠিক তা নয় রে আবদুল! এত ঠাণ্ডা যে, ঘরে টিকতে পারে না ওরা। তার উপর আছে বংশরক্ষার তাগিদ এবং ভ্রমণের আনন্দ। আর আশ্চর্য ঐ পশুপাখিদের জাতটা বুঝলি? বংশ রক্ষার জন্য কোন বিপদকে তারা বিপদ বলে মনে করে না। প্রশান্ত মহাসাগরের গভীর জল থেকে শীতকালে বঙ্গোপসাগরের উপকূলে ছুটে আসে হাজার হাজার কাছিম শুধু ডিম পাড়ার জন্য। বর্ষার আরম্ভে মাঝ সমুদ্র থেকে নদীর মোহানায় মিঠে জলের সন্ধানে ছুটে আসে চিংড়ি ও ইলিশের ঝাঁক। সমুদ্রে এক রকমের বান মাছ থাকে, ওরা উষ্ণস্রোত ধরে হাজার হাজার মাইল ছুটে গিয়ে ইংলণ্ডের উপকূলে ডিম পেড়ে আসে। তা না হলে ডিম ওদের ফুটত না।

ক্ষণকাল নীরব থেকে পুনরায় বললেন অমৃত মাস্টার—যে দেশে হাঁসেরা বাস করে সে দেশে এত শীত যে ডিম ফুটে বাচ্চা বেরুতে পারে না। অথচ প্রকৃতির খেয়ালে এই শীতকালেই তাদের ডিম পাড়ার সময়। তাই তারা ছুটে আসে আমাদের অতিথি হতে। তোরাও যেমন তোদের ছেলেমেয়েদের জন্য জীবনপণ করে খেটে

চলেছিস, ওরাও তেমনি রে !

—আর কোন দেশে ওরা অতিথি হয় না ? জিজ্ঞাসা করল আবদুল।

—সব দেশেই দেখা যায় যাযাবর পাখীর দল। ইংলণ্ডে এদের এত বেশি দেখা যায় যে, অনেক সময় পাখীতে পাখীতে সারা আকাশ ছেয়ে যায়। সে তুলনায় আমাদের দেশে তো অনেক কম।

উঠে পড়লেন অমৃত মাস্টার। আবদুল মুখে চুক্‌চুক্ করে এক রকম শব্দ করল। তারপর তাকাল রাখীর কোলে হাঁসটার দিকে। দেখল, হাঁসটা ড্যাব ডেবে চোখে কেবলই তাকিয়ে আছে আকাশের পানে। আবদুল উঠে তার গায়ে একবার হাত বুলিয়ে দিল। হি হি করে হেসে উঠল রাখী। বলল—মাস্টার কী বললে আব্বা, ওর নাম অতিথি ?

—হাঁ অতিথি। মাথা দোলাতে দোলাতে বলল আবদুল।

মাঠে পড়ে রইল জল খাবারের থালা। হাঁসটাকে বুকে চেপে রাখী ঘরে ফিরে এল। উঠানে পড়েছিল বাখারি দিয়ে বোনা শূন্য একটা মুরগীর খোঁয়াড়। রাখী তারই ভেতরে বাঁধন খুলে ছেড়ে দিল হাঁসটাকে। বাড়ী ফেরার পথে এক গোছা ধানের শীষও এনেছিল সে। শীষগুলো খোঁয়াড়ের ভেতরে রেখে দিল। চটা ওঠা পুরানো এক কলাই-করা বাটিতে দিল জল।

দুপুরে আবদুল এল ঘরে। দেখল, অতিথির যত্নের কোন ত্রুটি হয়নি। তথাপি অতিথি মাটিতে বুক চেপে পড়ে আছে আর আগের মতই ড্যাবডেবে চোখে তাকিয়ে আছে নীল আকাশের পানে। রাখী কাছেই ছিল। জিজ্ঞাসা করল—আচ্ছা আব্বা, আমাদের হাঁসরা তো ধান খায়, ও কেন খাচ্ছে না ? না খেলে মরে যাবে যে ?

এক গাল হেসে আবদুল বলল—বাঘের খাঁচায় মানুষকে পুরে তার মুখে মণ্ডা মেঠাই ধরলে সে কী খেতে পারে রে বিটি ?

রাখী তার আব্বার কথা বোধহয় বুঝতে পারল না। জিজ্ঞাসা করল—ওরা বুঝি মাছ খায় ?

—হয়ত খায়।

—আর কি কি খায় ?

আবদুল বুদ্ধি খরচ করে বলল—গেঁড়ি, শামুক, পোকা-মাকড়।

তৎক্ষণাৎ পুকুর পাড়ে ছুটে গেল রাখী। কয়েক মুঠো গেঁড়ি এনে ধরল হাঁসটার মুখের কাছে। তবুও খেল না হাঁসটা। রাখী তার তুলতুলে নরম হাত দিয়ে পাখীটার গলা জড়িয়ে ধরে বলল—তোর রাগ হয়েছে না-রে অতিথি ? বিকেলে ছিপ ফেলে কই মাছ ধরে খাওয়াবো তোকে। এখন খা এগুলো।

তবুও খাওয়ার কোন লক্ষণই প্রকাশ করল না হাঁসটা। এবার ভয়ানক বিব্রত বোধ করল রাখী। আদর করে পুনরায় বলল—লক্ষ্মী মাণিক আমার, খা এখন ! একটু পরে গরম গরম ভাত দেবো,—বিকেলে কইমাছ খাওয়াবো, দুধ-পাটালিও দেবো। এবার খুশি তো ?

হঠাৎ হাঁসটার পেটের তলায় হাত পড়তে চমকে উঠল রাখী। ছুটে গিয়ে আবদুলের পিঠের উপর উপুড় হয়ে বলল—ওর যে জ্বরে গা পুড়ে যাচ্ছে আব্বা ! এক্ষুনি একবার শক্তি ডাক্তারকে খবর দাও না !

হেসে আবদুল জবাব দিল—বিকেলে মাঠ থেকে ফেরার পথে শক্তিকে ডাকবো'খন। তুই এখন খেতে বোস দেখি ?

রাখীর আম্মা রাখীকে এতখানি লাই দেওয়ার জন্য বেশ একচোট বকাবকি করল আবদুলকে। কিন্তু এত বড় বদরাগী যে আবদুল, সেও নীরবে বকুনিগুলো হজম করে উঠে গেল হাসিমুখে।

সন্ধ্যায় রাখীর দাদা লতিফ এল ঘরে। ভোরে উঠে সে দৈনিক যায় জনমজুরী খাটতে। আজ উঠানে হাঁসটাকে দেখে তার চোখগুলো গোল গোল হয়ে উঠল। জিজ্ঞাসা করল—উটিকে কোথায় পেলিরে রাখী ? রাখী আবোল তাবোল অনেক কথাই বলে গেল। শেষে বলল—অমৃত মাস্টার বলেছে, ওর নাম নাকি অতিথি। সত্যি ভাই ?

হো হো করে হেসে উঠল লতিফ। হাসি থামিয়ে বলল—অতিথিকে একটু যত্নআত্তি করিস। ধানা কাটা শেষ হলে হাট থেকে আদা গরম মশলা এনে ভাল করে ঝোল বাগানো যাবে। মুখ ভার করে রাখী বলল—তুই বড় রাক্‌খস ভাই ! ওকে কিছুতে আমি মারতে দেব না। আমি পালবো।

হেসে লতিফ বলল—তোকে পালতে না বলছে কে ? আরও দিনকয় ওর সেবা কর। তারপর না হয়।

—না, কখ্‌খোনো না। তুমি দেখে নিও।

আট আটটা দিন কেটে গেল। পাখীটা এখন এক আধটু খায় আর অস্ফুট স্বরে কি যেন বলতে চায়। মাঝে মাঝে ঝপ্‌ঝপ্ করে উড়বার চেষ্টা করে, কিন্তু প্রতিবারে পাখা ঠেকে খোঁয়াড়ের গায়ে।

লতিফ গতকাল হাট থেকে মশলা পাতি এনেছে। দুজন বন্ধুকেও করেছে নিমন্ত্রণ। কাল বাদে পরশু হবে

ভোজ। রাখীকে কিন্তু এসব কথা ঘুণাক্ষরে কেউ জানায়নি।

আবদুল তার ঘরের দাওয়ায় রোজ রাতে ঘুমায়। তার পাশে আর একটা বিছানা পেতে ঘুমায় লতিফ। রাখী ও তার আম্মা ঘুমায় ঘরের ভেতরে। আজ লতিফ ঘরে নেই। বন্ধুদের সঙ্গে হৈ হৈ করতে করতে চলে গেছে যাত্রা শুনতে।

মাঝরাতে হাঁসটার পাখা ঝটপটানি শুনে ঘুম ভেঙ্গে গেল আবদুলের। জ্যোৎস্না রাত। কাঁথার ভেতর থেকে মুখটা বার করে আবদুল তাকাল খোঁয়াড়ের দিকে। দেখল, হাঁসটা বার বার অব্যক্ত এক করুণ সুরে কঁকিয়ে উঠছে আর পাখা নাড়ছে। কী ভেবে সেই প্রচণ্ড শীতের রাতে গায়ে চাদরটা জড়িয়ে উঠে এল আবদুল। তাকে দেখে কোঁর কোঁর করে এক রকম শব্দ করল হাঁসটা। ঠিক সেই সময় আকাশ থেকে ভেসে এল সাঁ সাঁ শব্দ। জ্যোৎস্নালোকে দেখল আবদুল, সাদা সাদা তীরের ফলার মত এক ঝাঁক হাঁস উড়ে চলেছে দক্ষিণ সমুদ্রের দিকে।

উপরের দিকে তেমনই হাঁ করে তাকিয়ে রইল আবদুল। কিছুক্ষণ পরে উড়ন্ত হাঁসের ঝাঁক বিলীন হয়ে গেল দিগন্তে। মুখটা ভারি করে মাথা নামাল আবদুল। এবার দেখতে পেল, খোঁয়াড়ের হাঁসটা সেই যে মুখ উঁচু করে আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে আর নামাচ্ছে না। বুকটা কেমন যেন মোচড় দিয়ে উঠল তার। হঠাৎ কানের কাছে ঝঙ্কার দিয়ে উঠল অমৃত মাস্টারের কথাগুলো—

"বংশ রক্ষার জন্য কোন বিপদকে ওরা বিপদ বলে মনে করে না। কেবল ওরা নয়, জীবমাত্রই আপন অস্তিত্বকে সন্তানের মধ্যে রক্ষা করার জন্য মরণ পণ করে লড়াই করে চলে প্রকৃতির বিরুদ্ধে। অমর হতে চায় সে।"

আবদুলের মনের কোণে ভেসে উঠল, লতিফ ও রাখীর মুখ দুটি। লতিফের চেহারা অনেকটা আবদুলের মতই। আর রাখী দেখতে তার মায়ের মত। হঠাৎ এক চরম সত্যকে সে আবিষ্কার করে ফেলল। বুঝতে পারল, সে অমর। চিরকাল পৃথিবী বহন করে চলবে তার বংশধারাকে। কিন্তু ঐ হাঁসটা? সেও তো অমর হতে চায়?

উপর থেকে পুনরায় ভেসে এল সেই সাঁ সাঁ শব্দ। চিন্তাসূত্র ছিন্ন হয়ে গেল আবদুলের। বুঝতে পারল, আবার আসছে একদল যাত্রী। কোঁর কোঁর করে আর একবার ডেকে উঠল খোঁয়াড়ের হাঁসটা। আবদুল আর থাকতে পারল না। হাঁসটাকে বার করে ছুঁড়ে দিল আকাশে। পাখীটা অস্ফুট স্বরে ডাক দিতে দিতে মাথার উপর গোটা দুই চক্কর দিল। তারপর তীরবেগে ছুটে গেল দলের দিকে।

অনির্বচনীয় এক আনন্দে ভরে গেল আবদুলের মনটা। পুনরায় বিছানায় যেতে সে ভুলে গেল। দলের পর দল বালুহাঁস, সরাল, মানিক, হাড়গিলে চলে গেল দক্ষিণ সমুদ্রের দ্বীপগুলোর দিকে।

লোনা চাতরের দিক থেকে শেয়ালরা রাত্রির শেষ প্রহরের কথা ঘোষণা করে গেল। তিন তিনবার ডেকে গেল মোরগ। তারপর দক্ষিণ-সমুদ্রের মাথায় আকাশটা রাঙা হয়ে উঠল। তবুও স্থাণুর মত আকাশের দিকে তাকিয়ে বসে রইল আবদুল।

এক সময় দোর খুলে ছুটে এল রাখী। শূন্য খোঁয়াড় দেখে ডুকরে কেঁদে উঠল। জিজ্ঞাসা করল—আব্বা, আমার অতিথি?

মেয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে আবদুল ভারি গলায় উত্তর দিল—অতিথি চলে গেছে।

পোঃ কালিন্দা, মেদিনীপুর

মজার ছবি—১

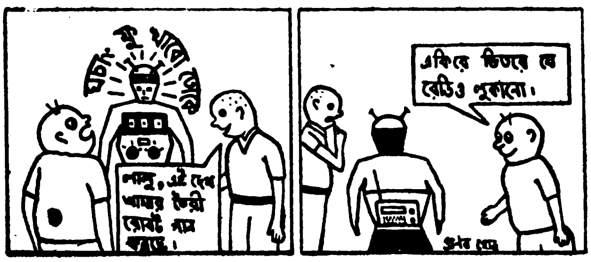

মজার ছবি—২

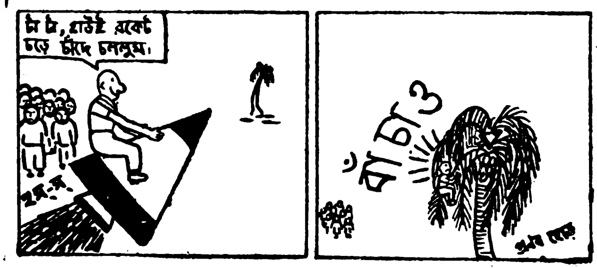

বিজ্ঞানের ভেল্কি

অদ্ভুত ডিমবাজি

যাদু সম্রাট এ. সি. সরকার

এবারকার ভেল্কিটাও ডিম নিয়ে, তাই এটাকে ডিম-বাজিও বলতে পারো ভোজবাজি না বলে। আসলে কিন্তু কাজটা ভোজবাজির মতই চমকপ্রদ। এ এমন একটি ব্যাপার যা সাধারণ জ্ঞান বুদ্ধির মাপ কাঠিতে মাপতে গেলে অসাধারণ বলেই মনে হবে। সচরাচর সাধারণ ক্ষেত্রে নিয়ত যে সব কাণ্ড কারখানা সংঘটিত হয় তার কারণ এবং ফল থাকে আমাদের বুদ্ধি সংস্কার ও ধ্যানধারণার সঙ্গে খুব ঘনিষ্ঠ ভাবে পরিচিত। এই কারণেই সে সব নিত্য-দিনের পরিচিত ব্যাপারস্যাপার আমাদের ভেল্কি বলে মনে হয় না। কিন্তু ব্যাপারটা যদি এমন হয় যার ব্যাখ্যা আমাদের নিত্যদিনের অভিজ্ঞতা বা বোধ-বুদ্ধির বাইরে, তবেই কিন্তু তা হয়ে পরে ভেল্কি—বিস্ময়ের ব্যাপার।

যাদুকরেরা ভেল্কির ব্যাপারী। আজব কাণ্ডকারখানা নিয়েই তাদের কাজ-কারবার। আমিও যাদুকর আর তাই যত সব আজব, অদ্ভুত ব্যাপারস্যাপার নিয়েই আমার কাজ-কারবার। পৃথিবীর নানা দেশে নানান পরিস্থিতিতে নানান পরিবেশে আমাকে পরিবেশন করতে হয় ভেল্কি-বাজির নানান কাণ্ডকারখানা। অনেক সময় মায়াজালের কারবারী যাদুকরদের মজলিসেও দেখাতে হয় ম্যাজিকের মজা। এসব পরিস্থিতিতে, বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই আমি পরিবেশন করি ম্যাজিকের মোড়ক মোড়া 'বিজ্ঞানের ভেল্কি'। এতে করে গঙ্গা জলে গঙ্গা পুজো করার দায় থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। এমনি একটি ঘটনার কথা এবার বলছি। ব্যাপারটা ঘটেছিল সেবার যখন আমি প্রথম জাপানের রাজধানী টোকিও শহরে যাই তখন।

একদিন আমন্ত্রিত হলাম জাপান ম্যাজিক এসোসিয়েশনের ক্লাব রুমে। আসর জমজমাট। পানাহার চলছে। সভাপতি সাটানু হাসেগাওয়া সভ্যদের সঙ্গে আমাকে পরিচিত করিয়ে দিলেন বিশ্ববিখ্যাত ভারতীয় যাদুকর বলে। সবাই সাগ্রহে আমাকে অভিনন্দন জানালেন আর উৎসুক ভাবে দেখতে চাইলেন একটি 'তেজিনা' [বাংলা ভাষায় যাকে বলে যাদুর খেলা]।

আমি প্রস্তুত হয়েই ছিলাম। অনুরোধের সঙ্গে সঙ্গে পকেট থেকে বের করলাম দুটো মোটা তারে তৈরী লম্বা হুক। অন্য পকেট থেকে বের করলাম দুটো ডিম আর দুটো রবার ব্যাণ্ড। ডিম দুটোর গায়ে লম্বালম্বি ভাবে একটা একটা করে রবার ব্যাণ্ড জড়িয়ে এক একটা তারের হুকের আংটার সঙ্গে লম্বালম্বি ভাবে লটকে দিলাম (ছবি দেখ) এক একটা ডিম।

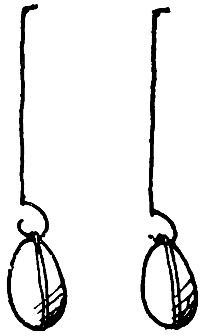

তার পরে দুজন সভ্যকে ঝুলন্ত ভাবে উঁচু করে ধরে থাকতে বললাম ডিম-ঝোলা দুটো তারের হুক। পাশাপাশিই দাঁড়ালেন দু'জন আমার সামনে। হুকে ঝোলা ডিম দুটোও লটকে থাকলো পাশাপাশি। আমি দু হাতে দুটো ডিম ধরে গুণে গুণে সমান সংখ্যক পাক দিলাম দুটো ডিমে একই দিকে—ইচি, নি, সান, সি… [জাপানী ভাষায় এক, দুই, তিন, চার…]। পাক খাইয়ে দুহাতে দুটো ডিম ধরে থাকলাম অল্পক্ষণ। তারপর একটা ডিমের উপরে মন্তর পড়ে একবার ফুঁ দিয়ে এক সঙ্গে ছেড়ে দিলাম দুটো ডিম।

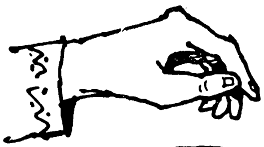

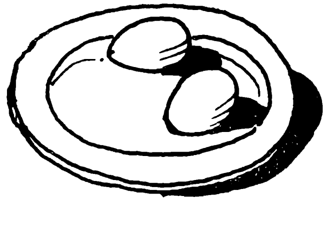

রাবার ব্যাণ্ডের পাক ছাড়ানোর জন্য দুটো ডিমই এক সঙ্গে সবেগে উল্টো দিকে মোচড় খেতে থাকলো আর অবশেষে থেমে গেল এক সময়। যা হওয়া স্বাভাবিক তাই হল। কিন্তু ঝামেলা বাঁধলো মন্তর পড়া ডিমটাকে নিয়ে। সেটা সহজে থামে না। একবার থামে তো পরক্ষণেই উল্টো মোচড়ে পাক খেতে থাকে। বারকতক এমনি ধারা মন্তরের প্রভাব দেখানোর পরেই তবে সেটা অনড় হয়ে থামে। মন্তর পড়া আর মন্তর না পড়া, এই দুই রকমের দুটো ডিমের কাজ কারবার দেখে তো জাপানী যাদুকর বন্ধুরা মহানন্দে হাততালি দিয়ে উঠলেন।

এর পরে ডিম দুটোকে রাবারব্যাণ্ড থেকে মুক্ত করে

রাখলাম একটা ডিসের উপরে। আগের বার যে ডিমে মন্তর পরিনি সেটাতে চিহ্ন দিয়ে, তাতে এবার মন্তর পড়লাম। সবার দৃষ্টি সে দিকে আকর্ষণ করে এর পর দুটো ডিমকেই পাক খাইয়ে ঘুরিয়ে দিলাম। দুটো ঘুরন্ত ডিমকেই একবার ক্ষণেকের জন্য ছুঁয়ে থামাতে বললাম একজন সভ্যাকে। যে ডিমকে এবার মন্ত্র পড়িনি সেটা অনড় হয়ে থেমে পড়লো ক্ষণিকের ছোঁয়াতেই। মন্তর পড়া ডিমটা কিন্তু ক্ষণিক বিরতির পরও আবার সচল হয়ে ঘুরতে থাকলো আপন ছন্দে অপ্রতিহত ঘূর্ণন গতিতে! মন্ত্রের কী অদ্ভুত ক্ষমতা তাই না? শিখবে মন্তরটা? শুনে নাও ঃ—

শেয়াল ডাকে হুক্কা হুয়া, কোথায় আমার হুক্কা রে!
মন্ত্র-ছাড়া ডিমের গতি, দেখছি যাদুর হুক কাড়ে!!...

একটা ব্যাপারে হুঁশিয়ার করে দিচ্ছি শোনো! শুধু মাত্র এই মন্তরের উপরে নির্ভর করে যদি এই ভেল্কিটা দেখাতে যাও তবে কিন্তু দর্শকদের কাছে নাকালের চূড়ান্ত হতে হবে। এ মজাটা করতে হলে আগে থেকে একটা বিজ্ঞানভিত্তিক কারসাজি করে নিতে হবে। যে ডিমটার উপরে মন্তরটা পড়বে, সেটাকে এমন ভাবে কড়া সেদ্ধ করবে যাতে তার খোলসে ফাটল না ধরে বা বর্ণ বিকৃতি না হয়। চেহারায় যেন সেটা থাকে তার সঙ্গী কাঁচা টাটকা ডিমটার মতন।

দর্শকেরা জানবে দুটো ডিমই এক রকম। ঘূর্ণন গতির ব্যাপারে টাট্‌কা কাঁচা ডিম আর সুসিদ্ধ ডিম, এ দুয়ের প্রকৃতিতে বিশেষ পার্থক্য রয়েছে।

সুসিদ্ধ ডিম যখন ঘোরে তখন তার খোসা সমেত গোটা দেহটাই একটা নিরেট বস্তু-পিণ্ডের গুণ সম্পন্ন হয়ে তার দেহের প্রতি বিন্দুতে একই বেগ ও একই গতি সঞ্চারিত হয়।

দ্বিতীয় ক্ষেত্রে কিন্তু জয় হয় টাটকা কাঁচা ডিমেরই। শুরুতে ঘোরানো চালু করার সময় ডিমকে যে ঘূর্ণন বেগ দেওয়া হয় সেটা এক যোগে একই সঙ্গে সঞ্চালিত হয় ডিমের খোসায় এবং লালাতে। হঠাৎ ছুঁয়ে ক্ষণেকের জন্য থামালে খোসার গতি ক্ষণেকের জন্য থামে বটে কিন্তু খোসার থেকে আলাদা লালা অংশ তখন ঘূর্ণন বেগ ধরে রাখে। খোসা থেকে হাত সরানোর পরক্ষণেই লালার এই ঘূর্ণনকে সঞ্চালিত হয়ে গোটা ডিমটাকেই আবার গতিশীল করে ঘোরাতে থাকে।

সিদ্ধ করার পর লালা অংশটা নিরেট হয়ে খোসার সঙ্গে সেঁটে থেকে এক অবিচ্ছিন্ন বস্তু-পিণ্ড হয়ে যাওয়াতে খোসার গতি রুদ্ধ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গোটা ডিমটাই অচল অনড় হয়ে পড়ে। সাবধানে করে দেখ। এ ভেল্কি দেখিয়ে খুব মজা করতে পারবে।

এ. সি. সরকার, ১২/৬, সেলিমপুর রোড, কলিকাতা-৩১

কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞান
আয়োজিত
রচনা প্রতিযোগীতা

মান ঃ ষষ্ঠ, সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণী

প্রথম পুরস্কার ২৫৲ দ্বিতীয় ২০৲ তৃতীয় ১৫৲

বিষয় সূচী

ষষ্ঠ শ্রেণী ঃ **পরিচিত পাখি** ॥ শব্দ সংখ্যা ২৫০
সপ্তম শ্রেণী ঃ **প্রিয় বিজ্ঞানী** ॥ শব্দ সংখ্যা ৩০০
অষ্টম শ্রেণী ঃ **গাছের মূল্য** ॥ শব্দ সংখ্যা ৪০০

নিয়মাবলী

[এক] মার্জিন সহ পৃষ্ঠার একদিকে পরিষ্কার হস্তাক্ষরে রচনা লিখে পাঠাতে হবে।
[দুই] নীচের কুপনটি পূরণ করে রচনার সঙ্গে পাঠাতে হবে।
[তিন] প্রেরিত রচনার ফেরত পাঠানো সম্ভব হবে না। পুরস্কৃত রচনা কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞানে প্রকাশিত হবে।

কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞানের দপ্তরে রচনা পাঠাবার শেষ তারিখ ঃ— ৩১শে মার্চ ১৯৮২

কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞান

প্রতিযোগীতার নাম ঃ.................বয়স......
ঠিকানা ঃ ....
....
শ্রেণী.....................রচনার বিষয়..........
প্রতিযোগী স্বাক্ষর..
প্রধান শিক্ষক/শিক্ষিকার স্বাক্ষর..........................

বিজ্ঞান ক্লাব সংবাদ

আচার্য সত্যেন বসু বিজ্ঞান সংসদ

১৯৮০ সালের ২৬শে জানুয়ারি বেহালার সরশুনা, বকুলতলা ও বড়িষার কয়েকজন উৎসাহী বিজ্ঞান প্রেমীর প্রচেষ্টায় এই সংস্থা জন্মলাভ করে। এই সংস্থার উদ্দেশ্য (১) সাধারণ মানুষের মধ্যে বিজ্ঞান সচেতনতা বৃদ্ধি (২) বিজ্ঞান প্রদর্শনী ও আলোচনা সভার মাধ্যমে ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে উৎসাহ জাগিয়ে তোলা (৩) স্থানীয় বিভিন্ন সমস্যার ব্যাপারে অনুসন্ধান ও সম্ভবপর হলে তার বিজ্ঞানভিত্তিক সমাধান করা (৪) বিভিন্ন সংগ্রহশালা, কারখানা ও প্রাকৃতিক পরিবেশে ভ্রমণের মাধ্যমে সামাজিক ও অনুসন্ধিৎসু মানসিকতার গঠন। সর্বোপরি বিজ্ঞানকে জনপ্রিয় করে তোলাই মূল লক্ষ্য।

এই বিজ্ঞান ক্লাবের সভ্যগণ প্রতি রবিবার সন্ধ্যায় সরশুনা হাইস্কুলে মিলিত হন। এর মধ্যে প্রথম রবিবার সভ্যগণ ক্লাবের বিভিন্ন কর্মপদ্ধতি বিষয়ে আলাপ আলোচনা করেন এবং দ্বিতীয় রবিবারে ক্লাবের কোন সভ্য বা আমন্ত্রিত কোন ব্যক্তি বিজ্ঞান বিষয়ক আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। এই ধরনের আলোচনায় ইতিমধ্যেই BARC, Indian Oil ; E.I.P.W. LTD, Indian Plywood Research Institute, Jadavpur University, Vivekananda College প্রমুখ সংস্থার বিভিন্ন ব্যক্তি অংশ গ্রহণ করেছেন।

১৯৮০ সালে সংস্থা কয়েকটি প্রদর্শনীর আয়োজন করেন। এর মধ্যে চক্ষুদান বিষয়ে মানুষকে অবহিত করার জন্য বিশ্বভারতীর আমন্ত্রণে পৌষ মেলায় এবং বিষ্ণুপুরে প্রদর্শনীটি দুটি এবং সরশুনা অ্যাসোসিয়েশনের আমন্ত্রণে সরশুনায় প্রদর্শনীটি সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। এছাড়া সরশুনা থেকে কিছুদূরে বাগপোতা, কলাগাছি গ্রামে চাষবাসের ব্যাপারে অনুসন্ধান ও গ্রামবাসীদের আধুনিক চাষবাসের প্রশ্ন প্রকরণ সম্বন্ধে অবহিত করার জন্য সংসদের একটি কর্মীদল গিয়েছিল।

১৯৮১ সালের ২৫শে জানুয়ারী সংস্থার প্রথম বর্ষ পূর্তি উপলক্ষে সংস্থা একটি বিজ্ঞান আলোচনা সভা, মডেল প্রদর্শনী ও স্লাইড শো-এর আয়োজন করে। বিজ্ঞান আলোচনা সভায় অংশ গ্রহণ করেন প্রোফেসর তারক মোহন দাস, ডঃ ক্ষেত্র প্রসাদ সেনশর্মা ও অধ্যাপক অশোক মুখোপাধ্যায়। এই বৎসরের ২০শে সেপ্টেম্বর সংসদ একটি বিজ্ঞান পদযাত্রার আয়োজন করেন। এই পদযাত্রায় চক্ষুদান, রক্তদান, পরিবেশদূষণ, কুসংস্কার, পারমাণবিক অস্ত্রের তৈরী জন্ম করা ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ে পোস্টার ছিল। এই পদযাত্রায় সমাজের বিভিন্ন বিভাগের মানুষ উপস্থিত ছিলেন।

সংসদের আমন্ত্রণে এই পদযাত্রায় অংশ গ্রহণ করেন সরশুনা হাইস্কুল, শিশু কল্যাণ পরিষদ, আর্য বিদ্যা মন্দির, সায়েন্স অ্যাসোসিয়েশন অফ্ বেঙ্গল, ঐকতান ক্লাব প্রভৃতি সংস্থা। পদযাত্রাটি শুরু হয় সরশুনা হাইস্কুলে, শেষ হয় বেহালা ট্রাম ডিপোতে। এ ছাড়া বিভিন্ন জায়গায় প্রদর্শনীতে অংশ গ্রহণ করা হয় যার মধ্যে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য হল ইণ্ডিয়ান মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশনের আমন্ত্রণে দে-গঙ্গায় চক্ষুদান বিষয়ে প্রদর্শনী। সংস্থার

বিজ্ঞান পদযাত্রায় সত্যেন বসু বিজ্ঞান সংসদ

বর্তমান সভাপতি ডঃ সুকল্যাণ বসু আর্যবিদ্যা মন্দির স্কুলের আমন্ত্রণে একটি বিজ্ঞান আলোচনা সভায় অংশ গ্রহণ করেন। এটি সংসদের পরিকল্পনার একটি অঙ্গ।

সংস্থার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার মধ্যে আছে (১) গ্রামীণ বিজ্ঞান ক্যাম্প (২) একটি বিজ্ঞান ম্যাগাজিন ক্লাব (৩) সংস্থার মধ্যে একটি Nature ক্লাব খোলা (৪) একটি দ্বিমাসিক বুলেটিন করা এবং (৫) বিভিন্ন স্লাইড Film তৈরী করা। সংস্থার বর্তমান সদস্য সংখ্যা হল পচাত্তর। এর মধ্যে ২৫ জন সক্রিয় সদস্য। ক্লাব চালাতে সংস্থা যেসব সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে তার মধ্যে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য হল অর্থনৈতিক অসুবিধা এবং অভিজ্ঞতার অভাব। তবে সকলের সহযোগিতা ও শুভেচ্ছার মধ্যে দিয়ে এই সংসদ এগিয়ে যাবার আশা রাখে।

(নিজস্ব প্রতিবেদক)

ইতিমধ্যে বর্ধমানে শুরু হল ম্যালেরিয়ার প্রকোপ
আচ্ছা, একি আকাল শুরু হল বল ত? আজ আবার হারানের বড় ছেলেটা মারা গেল
হুম্, খুবই চিন্তার বিষয়! লোকগুলো প্রায় বিনা ওষুধ-পথ্যে মারা যাচ্ছে। কিছু একটা না করলেই নয়।
কিরে বিনু তোর আবার কি হল?
কাত্তা মশাই, আমার বাবা-
বুঝেছি; আর বলতে হবে না। চল, দেখি কি করতে পারি
তোর বাবা বোধহয় এ যাত্রায় টিকে গেল রে। গতকাল পঞ্চার মা গেল, সময় মত ওষুধ পথ্য পড়লে হয়ত বেঁচে যেত
এইভাবে ভগবানচন্দ্র ম্যালেরিয়া আক্রান্ত রোগীদের সেবায় গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন অক্লান্তভাবে।
অবশেষে
দেখ, এ ভাবে সকলের বাড়ি বাড়ি গিয়ে ওষুধ দেওয়া তো সম্ভব নয়, তাই আমি এখন থেকে বাড়িতে সব প্রস্তুত করে রাখব, তোমাদের যার যখন দরকার হবে সে বিনা দ্বিধায় আমার কাছ থেকে নিয়ে যাবে
রোগের প্রকোপটা এখন অনেকটা কমেছে মনে হচ্ছে, এবার একটু বিশ্রাম নাও-
হ্যাঁ, খুব ধকল গেছে। এবার একটু বিশ্রাম দরকার।

আইভ্যান পেত্রোভিচ প্যাভলভ (১৮৪৯-১৯৩৬)

বিবেক রায়

অনেককাল আগে সোভিয়েত রাশিয়ায় বড় বড় শহরের পথে প্রায়ই ব্যাণ্ড বাজানো হতো। লোকে বলতোঃ ব্যাণ্ড বাদকদের সামনে দাঁড়িয়ে কখনও লেবু চুষো না। তাহলে ব্যাণ্ড বাজনা যাবে থেমে।—কেন থেমে যাবে? এ প্রশ্ন করলে তারা বলতো, লেবু চুষতে দেখলেই ওদের মুখে লালা আসে। সেই লালা এসে বাঁশী ও তার সমজাতীয় বাদ্যযন্ত্রের মুখ বন্ধ করে দেয়। ফলে বাঁশী বাজে না। ব্যাণ্ড বাজনা ব্যাহত হয়।

—এ ঘটনা সত্যি কি মিথ্যে সেটা বড় কথা নয়। তবে এটা সত্যি যে মানুষ জ্ঞাতসারে বা সজ্ঞানে মুখের লালা নিঃসরণ বন্ধ করতে পারে না। ১৯০৩ থেকে ১৯৩৬ সাল পর্যন্ত সময়ের মধ্যে প্রখ্যাত রুশ বিজ্ঞানী আইভ্যান প্যাভলভ একাধিক পরীক্ষা করে এর সত্যতা প্রমাণ করেন। আইভ্যান প্যাভলভকে আধুনিক যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শারীর বিজ্ঞানী আখ্যা দেওয়া হয়। ১৯০৪ সালে 'পরিপাক ক্রিয়ার শারীর বিজ্ঞান তত্ত্ব' আবিষ্কারের জন্যে প্যাভলভ নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। তিনিই প্রথম রাশিয়ান, যিনি নোবেল পুরস্কার লাভের গৌরব অর্জন করেন।

১৮৪৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ১৪ তারিখে আইভ্যান পেত্রোভিচ প্যাভলভের জন্ম হয়। তাঁর বাবা রাশিয়ার রিয়াসান গ্রামের পুরোহিত ছিলেন। আইভ্যানের প্রাথমিক শিক্ষা শুরু হয় ঐ গ্রামেরই চার্চ-স্কুলে। ছেলেবেলা থেকেই আইভ্যানের জ্ঞানার্জনের প্রবল স্পৃহা ছিল। স্কুলের লাইব্রেরীতে রুশ বিজ্ঞনীদের লেখা বই তিনি আগ্রহ সহকারে ঘণ্টার পর ঘণ্টা পড়তেন। এইচ, জি, ওয়েলস্-এর লেখা "ব্যবহারিক শারীর বিজ্ঞান" বইখানি পড়ে মানব দেহের কলকজাগুলির ক্রিয়াকর্ম জানবার আগ্রহ জাগে তাঁর মনে। তিনি চিকিৎসক হতে চান।

স্কুলের গণ্ডী পার হয়ে আইভ্যান প্রথেম লেনিনগ্রাদে সেন্ট পিটার্সবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন। সেখানকার পাঠ শেষ করে ভর্তি হন মেডিক্যাল একাডেমিতে। ছাত্রাবস্থায় ১৮৭৮ সালে তিনি যে কয়টি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছিলেন, তার থেকেই তাঁর মৌলিক চিন্তাধারার পরিচয় পাওয়া যায়। ১৮৮৩ সালে প্যাভলভ সেন্ট পিটারস্বার্গ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 'ডক্টর অফ মেডিসিন' ডিগ্রী লাভ করেন এবং পরের বছর সেখানে শারীর বিজ্ঞানের অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করেন। এই সময় তিনি বিদেশে ভ্রমণের জন্যে একটি বৃত্তি পান। সেই বৃত্তির অর্থে তিনি দু'বছরের জন্য জার্মানীতে যান। সেখানে প্যাভলভ জার্মান ভাষা শেখেন এবং সে দেশীয় অধ্যাপকদের অধীনে কাজ করে প্রভূত জ্ঞানার্জন করেন। ইংরেজী ভাষা তিনি ভালভাবে শেখেন নি। ইংরেজীতে গবেষণামূলক নিবন্ধ প্রকাশ না করায় ইংরেজ বিজ্ঞানীরা তাঁর বৈজ্ঞানিক গবেষণাগুলির গুরুত্ব প্রথমে উপলব্ধি করতে পারেন নি।

জার্মানি থেকে ফিরে ডক্টর প্যাভলভ পরিপাক ক্রিয়ার উপর তাঁর বৈজ্ঞানিক গবেষণা শুরু করেন। ১৮৯০ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় 'রাশিয়ান ইনস্টিট্যুট অফ এক্সপেরিমেণ্টাল মেডিসিন।' প্যাভলভকে ঐ ইনস্টিট্যুটের শারীর বিজ্ঞান বিভাগের অধিকর্তা পদে নিয়োগ করা হয়। এই পদে যোগ দিয়ে প্যাভলভ প্রথমেই কুকুরের উপর পরীক্ষাকার্য শুরু করেন। কুকুরের পরিপাক গ্রন্থি থেকে যে রস নিঃসৃত হয় তার নমুনা প্যাভলভ কুকুরের পাকস্থলী থেকে কৌশলে বের করে নিতেন। তারপর সেই নমুনাগুলি নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে খাদ্য হজম করার ক্ষেত্রে পাচক রসের ভূমিকা সম্পর্কে তিনি গবেষণা করতেন। তখনকার দিনে পরিপাক ক্রিয়ার রহস্য বিজ্ঞানীদের কাছে রহস্যাবৃত ছিল। প্যাভলভ পরীক্ষা করে দেখেন যে, পরিপাক গ্রন্থি থেকে নির্গত পাচক রস খাদ্যদ্রব্যকে পরিপাক করায় একাধিক রাসায়নিক পরিবর্তনের মাধ্যমে।

এরপর প্যাভলভ মানুষের পরিপাক ক্রিয়া নিয়ে অনুসন্ধান শুরু করেন। তিনি লক্ষ্য করেন যে, মানুষকে যদি বিভিন্ন পদের কয়েকটি খাদ্য একটি নির্দিষ্ট নিয়ম অনুসরণ করে দীর্ঘকাল ধরে পরপর পরিবেশন করা হয়, তাহলে খাদ্য পরিপাক ক্রিয়া তাড়াতাড়ি সম্পন্ন হয়। খাদ্য তালিকার পদগুলি পরিবেশনের ক্রমের পরিবর্তন ঘটালে, খাদ্য আগের তুলনায় কম হজম হয়। এ ভিন্ন প্যাভলভ পরীক্ষা করে দেখেন যে, একই খাদ্য সুস্বাদু করে না রাঁধতে পারলে সহজ-পাচ্য হয় না কিন্তু তা সুস্বাদু করে রাঁধলে সহজে পরিপাক হয়।—এখনকার দিনে খাদ্য সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান যথেষ্ট বেশী

বলে প্যাভলভের পরীক্ষালব্ধ ফলগুলি আমাদের বিস্ময়ের উদ্রেক করে না। কিন্তু যে কালে প্যাভলভ খাদ্য পরিপাক ক্রিয়া সম্বন্ধে তাঁর পরীক্ষালব্ধ ফলগুলি প্রথম প্রকাশ করেছিলেন, তখন তা সত্যিই মানুষের কাছে বিস্ময়কর বলে মনে হয়েছিল।

1892 থেকে 1897 সালের মধ্যে প্যাভলভ পরিপাক ক্রিয়ার উপর তাঁর গবেষণালব্ধ ফলাফল সম্বলিত একাধিক প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। "The Physiology of the Digestive Glands" নামে এই প্রবন্ধগুলি প্রথমে ফরাসী ভাষায়, পরে জার্মান ও ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত হয়। এগুলি প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই বিশ্বের বিজ্ঞানী মহলে প্যাভলভ সুপরিচিত হয়ে ওঠেন। তাঁর পরীক্ষালব্ধ ফলগুলি শারীরবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করে।

1897 সালে প্যাভলভকে 'মিলিটারি মেডিক্যাল অ্যাকাডেমিতে' শারীরবিজ্ঞানের অধ্যাপক পদে নিযুক্ত করা হয়। 1904 সালে শারীর বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন প্যাভলভ। 1906 সালে তিনি 'রাশিয়ান অ্যাকাডেমি অফ সায়েন্সেস'-এর সভ্য মনোনীত হন। পরের বছরই তাঁকে ইংলণ্ডের রয়্যাল সোসাইটির সভ্য মনোনীত করা হয়।

এবার প্যাভলভের গবেষণা এক নতুন দিকে মোড় নেয়। তিনি একটি কুকুরকে খাবার খেতে দেওয়ার একটু আগে ঘণ্টা বাজাতেন। রোজ এই রকম করার ফলে প্যাভলভ পরীক্ষা ক'রে দেখেন যে ঘণ্টা বাজালেই কুকুরটির লালা নিঃসরণ ঘটে, তারপর তাকে খাবার খেতে দেওয়া হোক বা না হোক। প্যাভলভ বলেন, এক্ষেত্রে ঘণ্টাধ্বনি কুকুরের উত্তেজনার উদ্রেক করে এবং সেই উত্তেজনায় কুকুর সাড়া দেয় লালা নিঃসরণ করে। উত্তেজনা যেন ক্রিয়া, আর লালা নিঃসরণ তার প্রতিক্রিয়া। প্যাভলভের ভাষায় এর নাম 'পরিবর্তী প্রতিক্রিয়া' বা Conditioned reflex. পরিবর্তী প্রতিক্রিয়া সংঘটিত হয় মস্তিষ্কের 'সেরিব্রাল হেমিস্ফিয়ার' নামক অংশ থেকে। 1907 সালে প্যাভলভ পরিবর্তী প্রতিক্রিয়া সংক্রান্ত তাঁর বক্তৃতামালা প্রকাশ করেন।

1917 সালে এক দুর্ঘটনায় প্যাভলভের উরুর হাড় ভেঙ্গে যায়। এ সময় তিনি পরীক্ষাগারে গিয়ে কাজ-কর্ম করতে পারতেন না। প্রাণীর মস্তিষ্ক নিয়ে এতদিন তিনি যে গবেষণা করেছিলেন তার ফলাফল এই সময় ঘরে বসে লিখে ফেলেন। পরবর্তীকালে সেই রচনাই "Lectures on the Work of the Cerebral Hemispheres" নামে একখানি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়।

প্যাভলভ বিশ্বাস করতেন যে, মানুষের মানসিক রোগের কারণ যত না মনের, তার বেশী দেহের। এ বিষয়টি নিয়ে তিনি মৃত্যুর বছর দশেক আগে থেকে গবেষণা শুরু করেন। তাঁর ধারণা হয় যে, বর্তমান সভ্য জগতে দৈনন্দিন জীবনের ঘাত-প্রতিঘাতগুলিই মানুষের স্নায়বিক বৈকল্য ঘটিয়ে মনোরোগ সৃষ্টি করে। তাঁর এই গবেষণা, মানসিক রোগের কারণ নির্ণয় ও তার উপযুক্ত চিকিৎসার সহায়ক হয়।

1928 সালে প্যাভলভ ইংল্যাণ্ড পরিভ্রমণে যান। রয়্যাল সোসাইটিতে তিনি 'ক্রোনিয়ান বক্তৃতা' দেন। বিদগ্ধ শ্রোতারা গভীর মনোযোগ ও আগ্রহ সহকারে খ্যাতনামা এই রুশ বিজ্ঞানীর বক্তৃতা শোনেন।

মানুষ হিসাবে প্যাভলভ ছিলেন খুবই সাদাসিধে প্রকৃতির। তিনি ছিলেন কঠোর পরিশ্রমী ও সময়ানুবর্তী। সময়ের সঙ্গে ছকে বাঁধা ছিল তাঁর প্রতিদিনের কাজ। ঠিক সকাল আটটায় প্রাতরাশ সেরে প্যাভলভ তাঁর পরীক্ষাগারে চলে যেতেন। পৌঁছুতেন সাড়ে ন'টায়। বেলা সাড়ে বারোটায় লাঞ্চ খেতেন। রাতের খাবার খেয়ে নিতেন সন্ধ্যা ছ'টায়। এরপর রাত ন'টা পর্যন্ত বিশ্রাম নিয়ে দশটা থেকে শুরু ক'রে মাঝরাত পর্যন্ত পড়াশুনা করতেন। সময়ের সঙ্গে ছকেবাঁধা ছিল তাঁর জীবন।

মৃত্যুর কয়েকদিন আগে স্বদেশের ছাত্র ও যুব সমাজের উদ্দেশে বলেছিলেন: "জীবনে একটা উদ্দেশ্য স্থির ক'রে নিয়ে সেই উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে একাগ্রচিত্তে তোমরা কাজ করে যাও। কখনই ভেবো না যে তুমি সর্বজ্ঞ। অপরে তোমার জ্ঞানের ভূয়সী প্রশংসা করলেও তুমি ভেবো যে কিছুই জান না।"

1936 সালে ছিয়াশি বছর বয়সে এই রুশ জ্ঞান তপস্বীর দেহাবসান ঘটে কিন্তু তাঁর নাম বিজ্ঞানের ইতিহাসে অমর হয়ে আছে।

পোঃ ইন্দা, খড়্গপুর, মেদিনীপুর

নতুন পাঠক্রমের চিন্তা-ভাবনা

কিন্নর রায়

নতুন পাঠক্রম অনুযায়ী ষষ্ঠ শ্রেণী থেকে অঙ্কের নতুন বই চালু হয়েছে। সিলেবাস যেমন বদলানো হয়েছে, তার সঙ্গে তাল রেখে বইও লেখানো হয়েছে সহজ-সরল পদ্ধতিতে। এর ফলে ছাত্রছাত্রীরা গণিতের ব্যাপারে আরও মনোযোগী হবে।

পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদের সভাপতি ভবেশ মৈত্র এক সাক্ষাতকারে একথা বলেন। তিনি বলেন, এই পাঠক্রম পড়ুয়াদের অহেতুক অঙ্কভীতি দূর করবে। সারা পশ্চিমবঙ্গের নামী পণ্ডিত অঙ্কের শিক্ষক অধ্যাপক ও শিক্ষক প্রতিনিধিদের সুচিন্তিত মতামতের ওপর ভিত্তি করেই এই নতুন পাঠক্রম তৈরী করা হয়েছে।

ভবেশবাবু আরও বললেন, পাঠক্রম রচয়িতারা যতটা সময় চেয়েছিলেন, পর্ষদ তাঁদের ততটাই সময় দিয়েছে। ওঁর মুখ থেকেই জানা গেল, জীবন-বিজ্ঞানের পাঠক্রমকে অনেক বেশি ছড়িয়ে দেয়া হয়েছে। ছাত্রছাত্রীরা যাতে পড়ালেখাকে আপন করে নিতে পারে, সেদিকে নজর দেয়া হয়েছে। পাঠক্রমকে সুস্পষ্ট করা হয়েছে। পর্যায়-ক্রমে এর ওপর বইও লেখা হচ্ছে। নামী ও অভিজ্ঞতা-সম্পন্ন শিক্ষক অধ্যাপক ও শিক্ষক প্রতিনিধিদের পরামর্শে সিলেবাস পুর্নবিন্যাসের কাজ এগিয়ে চলেছে।

ওঁর কাছ থেকে জানা গেল, নতুন পাঠক্রম অনেক জীবনমুখী হয়েছে। প্রসারিত সুস্থ পরিবেশের মধ্যে যাতে সবাই শিক্ষা লাভ করে সেদিকে চোখ রাখা হয়েছে। নিচু স্তর খেকে ধাপে ধাপে পরিবর্তনের চেষ্টা চলেছে। কারণ একসঙ্গে সব পাল্টে দিলে, তা ছাত্রদের কাছে দুর্বিষহ ভারবোঝা হয়ে দাঁড়ায়। ন'টি শিক্ষক সংগঠনের দু'জন করে, মোট আঠের জন প্রতিনিধি নিয়ে ১৯৭৭ সালে উপদেষ্টা কমিটি তৈরী হয় প্রত্যেক বিষয়ের জন্যে। ইতিহাস ভূগোলের পাঠক্রম বদল শুরু হয়েছে। নবম শ্রেণীর বদলাবে ১৯৮৩ সালে। ১৯৮৪ সালে দশম শ্রেণীর।

শ্রী মৈত্র জানালেন, প্রাথমিকের সঙ্গে সমতা রেখে মাধ্যমিকের পাঠক্রমও বদল হবে। ষষ্ঠ শ্রেণী থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত ইংরেজীর পাঠক্রম বদল করা হচ্ছে। মাতৃ ভাষার ব্যাপারটাও আলোচনার স্তরে।

শিক্ষকরা যাতে নতুন পাঠক্রম অনুযায়ী পড়ানোতে অভ্যস্ত হয়ে ওঠেন সেদিকেও নজর রাখা হয়েছে।

নতুন ইংরেজী পাঠক্রম চালু হলে সে ব্যাপারে শিক্ষকদের বিস্তারিত জানানোর জন্যে গাইড বই তৈরী হবে। অন্যান্য বিষয়ের ব্যাপারে গাইড বই তৈরী করা হচ্ছে। সেই বই ছাপিয়ে স্কুলে স্কুলে পাঠানো হবে।

তাঁর মুখ থেকেই জানা গেল, বিজ্ঞান শিক্ষায় উন্নতির জন্যে ব্যাপক আলোচনা সভা বা ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থাও হচ্ছে। পরীক্ষা পদ্ধতি পরিবর্তনের কথা ভাবা হচ্ছে। ১৯৮৪ থেকে মাধ্যমিক পরীক্ষায় ওয়ার্ক এডুকেশন পরীক্ষা পদ্ধতির পরিবর্তন হবে।

নতুন পাঠক্রম যথেষ্ট বিচার বিশ্লেষণ করার পর চালু করা হচ্ছে। এটা কোন চাপিয়ে দেয়া ব্যাপার নয়। পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদের সম্পাদক নির্মল সিন্‌হা একথা বললেন। তিনি জানালেন, জীবনের ওপর বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীকে প্রখর এবং সংহত করার জন্যে নতুন পাঠক্রমে চেষ্টা করা হচ্ছে। শিক্ষকদেরও এ ব্যাপারে প্রশিক্ষণ দেয়া হবে।

নির্মলবাবুর কাছ থেকে জানা গেল, প্রাচীন মধ্য ও আধুনিক—এই তিন পর্যায়ে ভাগ করা হয়েছে ইতিহাসকে। সেই ভিত্তিতেই পাঠক্রম তৈরী হচ্ছে। নিছক যুদ্ধ বা শুধু কোন ব্যক্তির জীবনী নয়, বিশ্বের সভ্যতায় মানুষের অবদান কি, তা ছাত্রদের সামনে তুলে ধরাই এ পাঠক্রমের মূল উদ্দেশ্য।

পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদের সহ-সম্পাদক জে. বি. দত্ত বললেন, একজন শিক্ষক হিসেবে আমার এই পাঠক্রম তৈরীর পদ্ধতি ভালো লেগেছে। যে স্তরের পাঠক্রম তা তৈরীতে সেই স্তরের শিক্ষকেরা বাস্তব অংশগ্রহণ করেছেন। এ ব্যাপারে পর্ষদ কিছু চাপিয়ে দেয়নি। খসড়া কমিটির মতামত ও তা নিয়ে আলোচনা থেকে একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছনো গেছে। খসড়া আলোচনায় পশ্চিমবাংলার ন'টি মাধ্যমিক শিক্ষক সংগঠনের দু'জন করে, মোট আঠের জন প্রতিনিধি ছিলেন। সাধারণ ভাবে সবাই ঐকমত্যে আসার পর সিলেবাস তৈরী হয়েছে।

শ্রী দত্ত শারদীয়া কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞান পড়েছেন। তাঁর ভালো লেগেছে। তিনি মনে করেন, এটি অত্যন্ত শিক্ষামূলক কাগজ।

লেখচিত্র অঙ্কনে সতর্ক হওয়া উচিত

ডঃ অসীম মুখোপাধ্যায়

মাধ্যমিক পরীক্ষায় গণিত প্রশ্নপত্রে লেখচিত্র অঙ্কন বিষয়ক প্রশ্নটি একরকম নিশ্চিত। বহু সংখ্যক পরীক্ষার্থী এই প্রশ্নের উত্তর দিয়ে থাকে কিন্তু দুঃখের বিষয়, অনেকেই ত্রুটিশূন্য উত্তরদানে সমর্থ হয় না। আলোচ্য নিবন্ধে লেখচিত্র অঙ্কন পদ্ধতি সম্বন্ধে সাধারণ আলোচনা করা হবে। পরীক্ষার্থীরা যে সব ভুলভ্রান্তি করে থাকে তার উল্লেখ করে তার প্রয়োজনীয় সংশোধনের ইঙ্গিত দেওয়া হবে। লেখচিত্র বিষয়টিকে কেবলমাত্র পরীক্ষায় পাশ করার হাতিয়ার হিসেবে দেখা উচিত নয়, ভবিষ্যৎ জীবনে বহুল ক্ষেত্রে এর প্রয়োজনীয়তা লক্ষিত হয়।

প্রশ্নপত্রে দুটি চলরাশি (x এবং y) সম্বলিত একঘাতবিশিষ্ট দুটি সমীকরণ দেওয়া হয়ে থাকে এবং তাদের লেখচিত্র অঙ্কনের নির্দেশ থাকে। বলা বাহুল্য, দুটি লেখচিত্র অঙ্কন পদ্ধতির মধ্যে কোন তারতম্য নেই। তবু প্রতিটি লেখচিত্র অঙ্কনে পরীক্ষার্থীর যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করা বিধেয়। আলোচ্য একঘাত সমীকরণ বলতে $ax+by+c=o$, এই ধরনের সমীকরণকে বোঝান হয়। এখানে লক্ষণীয় এই যে x এবং y প্রতীক চিহ্ন দুটি নির্দেশ করে দুটি চলরাশি এবং a, b, c প্রতীক তিনটি (a এবং b যুগপৎ শূন্য নয়) নির্দিষ্ট রাশির জন্য ব্যবহৃত হয়। x এবং y চলরাশিদ্বয়ের পরিবর্তনের মধ্যে যে সম্বন্ধ থাকে তার বীজগাণিতিক রূপ হলো সমীকরণ আর তার জ্যামিতিক রূপ হলো সংশ্লিষ্ট লেখচিত্র। কোন সমীকরণ দৃশ্যত অসার মনে হতে পারে কিন্তু তার লেখচিত্র হচ্ছে একটি প্রাণবন্ত প্রকাশ। লেখচিত্র যে শুধু সমীকরণকে পরিস্ফুট করে তা নয়, পরন্তু সমীকরণ সম্পর্কিত বহু কিছু তথ্যাদি (সামগ্রিক ও স্থানিক) লাভে সাহায্য করে।

লেখচিত্র অঙ্কনের জন্য বর্গাঙ্কিত কাগজ ব্যবহার করা হয়ে থাকে। বর্গাঙ্কিত কাগজ দুধরনের হয়—একটি সেন্টিমিটার মাপের অপরটি ইঞ্চি মাপের। ইঞ্চি মাপের ছক কাটা কাগজই লেখচিত্র অঙ্কনের পক্ষে শ্রেয়। দেখে নেওয়া উচিত কাগজে বর্গগুলি সুস্পষ্ট এবং সব সমান মাপের কি না ; তা না হলে অভীষ্ট লেখচিত্র ত্রুটি বহুল হয়ে যাবে। দেখা যায়, কোন কোন পরীক্ষার্থী ছাপান ছক কাটা কাগজ ব্যবহার না করে খাতার পৃষ্ঠায় ছক কেটে লেখচিত্র অঙ্কনে অগ্রসর হয়। বলা বাহুল্য, এসব ক্ষেত্রে পরীক্ষার্থীরা কোন নম্বর পায় না। বর্গাঙ্কিত কাগজের মাঝামাঝি লম্বভাবে প্রতিচ্ছেদী দুটি সরলরেখা মাপনীর সাহায্যে অঙ্কন করে নিতে হবে। লক্ষণীয় যে ঐ রেখা দুটি যেন ছক কাটা কাগজের কোন রেখা বরাবর হয়। রেখা দুটিকে অক্ষদ্বয় বলা হয়। বাঁদিক থেকে ডান দিকে অঙ্কিত রেখাটিকে x-অক্ষ এবং ওপর থেকে নিচ অবধি রেখাটিকে y-অক্ষ বলে চিহ্নিত করা হয়। বলা বাহুল্য, অক্ষদ্বয়ের ছেদ বিন্দু কোন একটি বর্গের কৌণিক বিন্দু, এই বিন্দুকে মূলবিন্দু বলা হয় এবং O দ্বারা চিহ্নিত করা হয়। মূলবিন্দু O থেকে সংশ্লিষ্ট অক্ষ বরাবর x এবং y চলরাশিদ্বয়ের মান (ধনাত্মক ও ঋণাত্মক) মাপা হয়। X′OX (বাঁদিক থেকে ডান দিকে) এবং YOY′ (ওপর থেকে নিচে) অক্ষদ্বয়ের নামকরণের মাধ্যমে অক্ষের কোন্‌দিক ধনাত্মক ও কোন্‌দিক ঋণাত্মক রাশির জন্য, তা নির্দিষ্ট হয়। স্বীকৃত যে $\overline{OX}$ এবং $\overline{OY}$, x এবং y চলরাশিদ্বয়ের ধনাত্মক মান এবং $\overline{OX'}$ এবং $\overline{OY'}$ ঋণাত্মক মান নির্দেশ করে। এই নির্দেশকে আরও স্পষ্ট করার জন্যে অনেক পরীক্ষার্থী X′OX এবং YOY′-এর পরিবর্তে X^-OX^+ ও Y^+OY^- লিখে ভালই করে। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য, অক্ষরেখার যে কোন দিকই ধনাত্মক বা ঋণাত্মক হিসেবে গ্রহণ করার পূর্ণ স্বাধীনতা সব পরীক্ষার্থীরই আছে অর্থাৎ প্রচলিত প্রথা পরীক্ষার্থী নাও মানতে পারে। তবে x-অক্ষের বাঁ দিক OX′ বা y-অক্ষের নিচের দিক OY′-কে ধনাত্মক দিক ধরা উচিত নয়। কারণ পরীক্ষার্থী তার নিজস্ব রীতি পরিষ্কারভাবে ব্যক্ত না করলে পরীক্ষকের পক্ষে যথেষ্ট ভুল বোঝার অবকাশ থেকে যায়। সেজন্য কোন ঝুঁকি না নিয়ে প্রচলিত প্রথা অনুসরণ করাই বুদ্ধিমানের কাজ। অক্ষরেখাদ্বয় অঙ্কনের সময় পরীক্ষার্থী নানাবিধ ভুলভ্রান্তি করে থাকে, যেমন X′, O, X, Y, O, Y′ ইত্যাদি প্রতীক ও অক্ষদ্বয় এমনই অস্পষ্ট বা আবছা করে আঁকে যে কিছুই দেখা যায় না, অক্ষদ্বয় আদৌ আঁকে না, দিক নির্দেশক X, X′ ; Y, Y′ প্রচলিত প্রতীকগুলির স্থান পরিবর্তন করে কিন্তু সেই মত সংশ্লিষ্ট চলরাশির মান নির্দেশ করে না, x এবং y চলরাশি নির্দেশক অক্ষদ্বয়কে

যথাক্রমে Y'OY এবং XOX' বা XOY এবং X'OY' লেখে, ইত্যাদি। সহজেই অনুমেয়, লেখপত্রে অক্ষদ্বয় অঙ্কিত না থাকলে পরীক্ষকের পক্ষে লেখচিত্র যাচাই করে নেওয়া খুবই কষ্টসাধ্য। উচিত হলো সফ্‌ট পেন্সিলের সাহায্যে অক্ষদ্বয় দুটি সুদৃশ্য করে আঁকা। সমগ্র লেখপত্রটি ফাঁকা রেখে কাগজের কোন এক ধারে লেখচিত্রের জন্য অক্ষদ্বয় আঁকা উচিত নয়, এতে সমগ্র লেখচিত্রটি সামঞ্জস্য-হীন দেখায়।

অক্ষদ্বয় আঁকার প্রাথমিক উদ্দেশ্য হলো প্রদত্ত সমীকরণের x এবং y চলরাশিদ্বয়ের সংগত মানের যাবতীয় জুটিকে লেখপত্রে বিন্দুদ্বারা চিহ্নিত করা। এই বিন্দুগুলির সমাবেশ বা সংস্থান যে রেখা নির্দেশ করে সেই রেখাই সংশ্লিষ্ট সমীকরণের লেখচিত্র। এই তত্ত্বটির সঙ্গে সব পরীক্ষার্থীর পরিচয় থাকা দরকার। জুটি নির্ণয়ের জন্য প্রদত্ত সমীকরণকে বিশেষ আকারে লিখে নিতে হয়। বিশেষ আকারটি হলো $y=mx+c$ বা $x=ky+d$। প্রদত্ত সমীকরণের পদগুলি প্রয়োজনবোধে পক্ষান্তর করার সময় বহু পরীক্ষার্থী ভুল করে। এই ধাপে কোন ভুল-ভ্রান্তি হলে সে ভুলের কোন মার্জনা নেই। সমীকরণের কোন পদ বা রাশি ডান পক্ষ থেকে বাঁ পক্ষে বা বাঁ পক্ষ থেকে ডান পক্ষে স্থানান্তরিত করার সাধারণ বীজ-গাণিতীয় নিয়মাবলীর দিকে দৃষ্টি রাখা উচিত। এই ক্ষেত্রে কোন ভুল হওয়ার অর্থ হলো পরবর্তী জুটিগুলি ভুল হবে এবং জুটি ভুল হলে লেখচিত্রও ভুল হবে। আকারগত সমীকরণে ($y=mx+c$) x-এর খুশীমত মান বসিয়ে y-এর মান পাওয়া যাবে। x এবং y-এর সংশ্লিষ্ট মানদ্বয় একটি জুটি তৈরী করে। এই জুটি তৈরী করার সময় দেখতে হবে যে x এবং y-এর উভয়মানই যেন পূর্ণসংখ্যা (ধনাত্মক বা ঋণাত্মক) হয়। পূর্ণসংখ্যা মানের জন্য পরীক্ষার্থীকে কিছু মানসিক গণনার আশ্রয় নিতে হয়। একটু সময় দিয়ে চিন্তা করলে x এবং y-এর অভীষ্ট মান পাওয়া যাবে। একথা ভাবলে ভুল হবে যে x এবং y ভগ্নাংশ বা অমূলদ হতে পারে না। কিন্তু লেখপত্রে একটি ছোট বর্গের বাহুকে সাধারণতঃ একক ধরা হয়, সেক্ষেত্রে x এবং y-এর ভগ্নাংশ মান অক্ষরেখার কোথায় হবে স্থির করতে গেলে অনুমানের ওপর নির্ভর করতে হয়। ফলস্বরূপ লেখচিত্রটি প্রকৃত চিত্র থেকে বিচ্যুত হবার সম্ভাবনা থাকে। x এবং y-এর মান উভয়ই পূর্ণসংখ্যা হলে, তাদের জুটি লেখপত্রের কোন না কোন বর্গের কৌণিক বিন্দুতে নির্দেশিত হয় এবং বিন্দু স্থাপনে কোন অসুবিধা থাকে না। প্রসঙ্গক্রমে আলোচনা করা চলে যে x-এর পূর্ণসংখ্যা মানের জন্য যদি y-এর ভগ্নাংশ মানের উদ্ভব হয়, তাহলে লেখপত্রে সুবিধামত কয়েকটি ছোটবর্গের বাহুকে একত্র করে একক ধরলে, আর অনুমানের অবকাশ থাকে না। মনে করি, x-এর কয়েকটি পূর্ণসংখ্যা মানের জন্য y-এর ভগ্নাংশ মান পাওয়া গেল $\frac{p}{q}, \frac{r}{s}, \frac{u}{v}$ ইত্যাদি। মনে করি q, s এবং v-এর ল. সা. গু. n, তাহলে n সংখ্যক ছোট বর্গের বাহু সমষ্টিকে একক ধরলে, জুটিগুলিকে লেখপত্রে স্থাপন করতে কোন অনুমানের দরকার পড়বে না। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, দুটি অক্ষরেখা বরাবর এককের মাপ একই রকম হওয়া চাই।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, লেখচিত্র অঙ্কনের জন্যে কটি জুটির প্রয়োজন। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে প্রশ্নপত্রেই এর নির্দেশ থাকে যথা, 'লেখ অঙ্কনে অন্ততঃ তিনটি করে বিন্দু স্থাপন করতে হবে'। বিষয়টির কিছু তাত্ত্বিক আলোচনা করা যেতে পারে। স্থানাঙ্ক জ্যামিতির মাধ্যমে প্রমাণিত হয়েছে যে একটি একঘাতবিশিষ্ট সমীকরণ $ax+by+c=0$ অক্ষতলে (লেখপত্রে) সর্বদা একটি সরলরেখা নির্দেশ করে। পুনরায় জ্যামিতির একটি মৌলিক স্বতঃসিদ্ধ আছে যে দুটি বিভিন্ন বিন্দু দিয়ে কেবলমাত্র একটি সরলরেখা সম্ভব। অতএব লেখচিত্র অঙ্কনে কেবলমাত্র দুটি জুটিই যথেষ্ট। দুয়ের অধিক জুটি থেকে নতুন কিছু পাওয়া যাবে না। তত্ত্ব যাই হোক না কেন, প্রশ্নপত্রের নির্দেশই পালনীয়। তাই অন্ততঃ তিনটি জুটি নির্ণয় অত্যাবশ্যক এবং লেখপত্রে তাদের বিন্দু হিসেবে দেখাতে হবে। তিনটি বিন্দু সংস্থাপনের একটি সার্থকতা আছে। তিনটি বিন্দু এক রেখায় অবস্থান না করলে বুঝতে হবে জুটি নির্ণয়ের গণনায় কোথাও ভুল আছে। এই সূত্রে স্মরণ রাখা দরকার যে জুটিগুলি এমন হওয়া উচিত যেন সংশ্লিষ্ট বিন্দুগুলি বেশ ব্যবধানে থাকে, অর্থাৎ বিন্দুগুলি বিভিন্ন পদে থাকা বাঞ্ছনীয়। সংস্থাপিত বিন্দুগুলি খুব নিকটবর্তী হলে সংশ্লিষ্ট লেখচিত্র ত্রুটিপূর্ণ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। সংস্থাপিত বিন্দুগুলি ছোট গোলাকার চিহ্ন দ্বারা বেষ্টন করে দিলে ভাল হয়। উদ্দেশ্য হলো, বিন্দুগুলিকে পরীক্ষকের দৃষ্টিগোচর করা। পূর্বেই বলা হয়েছে যে নির্ণেয় লেখচিত্র হবে একটি সরল রেখা, সেহেতু মাপনীর সাহায্যে তিনটি বিন্দুগামী যে রেখা পাওয়া যাবে তাই হবে

ঈপ্সিত লেখচিত্র। লক্ষ্য রাখা দরকার রেখাটি যেন সুস্পষ্ট হয় (সফ্ট পেনসিল ব্যবহার্য) এবং সংস্থাপিত বিন্দুগুলি থেকে একটুও বিচ্যুত না হয়। কোন কোন পরীক্ষার্থী লেখচিত্রটিকে সংস্থাপিত বিন্দুগুলির মধ্যে কেবল প্রান্তবর্তী দুটি বিন্দু পর্যন্ত বিস্তৃত করে, তাতে লেখচিত্রটি একটি রেখাংশে পরিণত হয়। এক্ষেত্রে পরীক্ষক অনায়াসে কিছু নম্বর কেটে নিতে পারেন কারণ লেখচিত্রটি বাস্তবে একটি সীমাহীন সরলরেখা। কাজেই যতদূর সম্ভব সুদৃশ্য করে চিত্রটিকে দুপ্রান্তেই মাপনীর সাহায্যে বর্দ্ধিত করা উচিত এবং লেখচিত্রটির সীমাহীনতা বোঝানোর জন্যে রেখাটির দুই প্রান্তে দুটি তীরচিহ্ন এঁকে দেওয়া বাঞ্ছনীয়। অনুরূপভাবে অক্ষদ্বয়ের প্রান্তেও তীর চিহ্ন দেওয়া যেতে পারে। লেখচিত্রের পাশে সংশ্লিষ্ট সমীকরণটি সুন্দর হরফে লিখে দিতে হবে। লেখচিত্র কালি দিয়ে আঁকা বিধেয় নয়। মনে রাখতে হবে যে লেখচিত্র অঙ্কনের নিপুণতা পরীক্ষার্থীর সৌন্দর্যবোধ ও শিল্পীমনের পরিচয় দেয়। জুটি নির্ণয়ের যাবতীয় গণনা এবং জুটি নির্দেশক খোপ বা ছক খাতার বাঁ পৃষ্ঠায় করা উচিত এবং লেখচিত্র অঙ্কনের জন্য পরীক্ষা-কক্ষে যে আলগা লেখপত্র দেওয়া হয় তা খাতার ডানদিকে আটকান উচিত, যাতে পরীক্ষক গণনাদি এবং সংশ্লিষ্ট লেখচিত্র পাশাপাশি রেখে সমগ্র উত্তরটি একসঙ্গে বিচার করতে পারেন। এটা উল্লেখ্য যে কেবলমাত্র জুটি নির্ণয়ের জন্য কোন নম্বর নির্ধারিত থাকে না। তাড়াহুড়োর মধ্যে লেখপত্র যেন খাতায় উল্টোভাবে লাগান না হয় তার প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা কর্তব্য কারণ সেক্ষেত্রে অঙ্কিত লেখচিত্রটি আপাতদৃষ্টিতে বেঠিক মনে হতে পারে। লেখপত্রে পরীক্ষার্থীর নাম ও ক্রমিক সংখ্যা ত থাকছেই। আর একটি কথা পরীক্ষার্থীর জানা দরকার যে লেখচিত্র অঙ্কন পদ্ধতি ব্যাখ্যা করার আদৌ প্রয়োজন নেই। কটি বর্গের বাহু সমষ্টিকে একক ধরা হচ্ছে তার উল্লেখও নিষ্প্রয়োজন, বিশেষ করে যদি একটি ছোট বর্গের বাহুকে একক ধরা হয়। পরীক্ষকের দৃষ্টিগোচরে আনার জন্য সাবধানী পরীক্ষার্থী লেখপত্রের কোন স্থানে এককের কথা উল্লেখ করতে পারে। জুটি নির্দেশক খোপগুলি লেখপত্রের ফাঁকা জায়গায় পুনরুল্লেখে দোষ নেই।

এবার একটি উদাহরণের মাধ্যমে সমীকরণের লেখচিত্র অঙ্কন পদ্ধতি দেখান হচ্ছে।

প্রশ্ন ঃ $3x - 4y = 11$ সমীকরণটির লেখচিত্র অঙ্কন কর।

উত্তর ঃ প্রদত্ত সমীকরণ $3x - 4y = 11$ বা, $-4y = 11 - 3x$ বা, $4y = -11 + 3x$ বা $y = \frac{3x - 11}{4}$

ধরি $x = -3,\ y = \frac{3(-3) - 11}{4} = -5$

" $x = 1,\ y = \frac{3(1) - 11}{4} = -2$

" $x = 9,\ y = \frac{3(9) - 11}{4} = 4$

সংশ্লিষ্ট ছক—

x	−3	1	9
y	−5	−2	4

লেখচিত্রের উপযোগিতা সম্বন্ধে কিছু আলোচনায় আসা যাক। লেখচিত্রের উপরিস্থিত সব বিন্দুর স্থানাঙ্কই সংশ্লিষ্ট সমীকরণকে সিদ্ধ করে। সেজন্য যে কোন

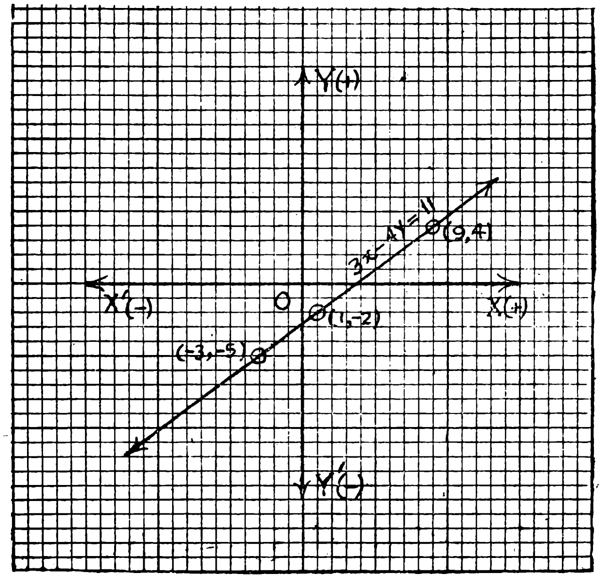

চিত্র—১

একটি চলরাশির (x বা y) নির্দিষ্ট মানের জন্য অপর চলরাশির মান কি হবে লেখচিত্রের সংশ্লিষ্ট স্থানাঙ্কের মান থেকে বলা যায়। দুটি সমীকরণের লেখচিত্রের ছেদবিন্দুর স্থানাঙ্ক থেকে সমীকরণদ্বয়ের সমাধান কি হবে তা নির্ণয় করা যায়। অর্থাৎ, $ax + by + c = O$ এবং $a'x + b'y + c' = O$ দুটি সহ-সমীকরণের লেখচিত্র যদি কোন বিন্দুতে ছেদ করে এবং সেই ছেদবিন্দুর

স্থানাঙ্ক (m, n) হয়, তাহলে উক্ত সমীকরণদ্বয়ের সমাধান হবে $x = m$, $y = n$, কারণ (m, n) বিন্দুটি উভয় লেখচিত্রে বিদ্যমান। বলা বাহুল্য, দুটি লেখচিত্র সমান্তরাল হলে কোন ছেদবিন্দুই থাকবে না। ইদানীং প্রশ্নপত্রে লেখচিত্র থেকে সমীকরণদ্বয়ের সমাধান সম্বন্ধে মন্তব্য করার জন্য প্রশ্ন করা হচ্ছে। প্রশ্নটি খুবই অস্পষ্ট। অনেক কিছুই মন্তব্য করা যেতে পারে; যেমন সমাধান আছে বা নেই, সমাধান কোন পাদে, প্রকৃত সমাধান কি, ইত্যাদি। লেখচিত্রের সাহায্যে এক চলরাশি বিশিষ্ট সমীকরণের সমাধান করা যায়। লেখচিত্র যদি কোন সীমাবদ্ধ ক্ষেত্র উৎপন্ন করে, চিত্র থেকে প্রয়োজনীয় রেখাংশের পরিমাপ থেকে সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রফলের সূত্রাদি (যথা, ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল $= \frac{1}{2}$ ভূমি $\times$ উচ্চতা, আয়তক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল $=$ দৈর্ঘ্য $\times$ প্রস্থ, ইত্যাদি) প্রয়োগ করে অভীষ্ট ক্ষেত্রফল নিণয় করা যায়।

লেখচিত্র সম্বন্ধীয় আর একটি প্রশ্ন থাকে প্রশ্নপত্রে। প্রশ্নটি হলো অসমীকরণের লেখচিত্র অঙ্কন বিষয়ক। বিষয়টি উচ্চতর গণিত এবং বহু ব্যবহারিক ক্ষেত্রে কাজে লাগে। একঘাতবিশিষ্ট অসমীকরণের সাবিক রূপ হলো $ax + by + c < 0$ বা $\leqslant 0$ বা > 0 বা $\geqslant 0$। প্রথমেই মনে রাখা দরকার যে সমীকরণের ($ax + by + c = 0$) লেখচিত্র যেমন একটি সরলরেখা (একমাত্রিক), অসমীকরণের ($ax + by + c \lesseqgtr 0$) লেখচিত্র তা নয়। অসমীকরণের লেখচিত্র হবে একটি অঞ্চল (দ্বিমাত্রিক)। তাই অসমীকরণের লেখচিত্র অঙ্কনে কেবলমাত্র সংশ্লিষ্ট সমীকরণের ($ax + by + c = 0$) লেখচিত্র (সরলরেখা) আঁকলে কোন নম্বর পাওয়া যায় না, যদিও অসমীকরণের লেখচিত্র অঙ্কনে উক্ত সমীকরণের লেখচিত্র অঙ্কন অপরিহার্য। তাই প্রথমে বর্গাঙ্কিত কাগজে পূর্ব বর্ণিত পদ্ধতিতে $ax + by + c = 0$ সমীকরণটির লেখচিত্র (সরলরেখা) অঙ্কন করে নিতে হবে। এই সরলরেখা সমগ্র অক্ষতলকে (লেখপত্র) দুটি অঞ্চলে বিভক্ত করবে; এরই মধ্যে একটি অঞ্চল প্রদত্ত অসমীকরণের লেখচিত্র হবে। কোন্‌টি হবে তা নির্ণয়ের একটি সহজ উপায় আছে। অক্ষতলের কোন বিন্দুর স্থানাঙ্ক (x এবং y) যদি অসমীকরণকে সিদ্ধ করে, তাহলে অঙ্কিত সরল রেখার দ্বারা বিভক্ত অক্ষতলের যে অঞ্চলে বিন্দুটি আছে, সেই গোটা অঞ্চলটি নির্ণেয় বা বাঞ্ছিত অঞ্চল হবে, কারণ উক্ত অঞ্চলের প্রতিটি বিন্দুই প্রদত্ত অসমীকরণটিকে সিদ্ধ করবে। পক্ষান্তরে, অপর অঞ্চলের কোন বিন্দুর স্থানাঙ্ক (x এবং y) প্রদত্ত সমীকরণকে সিদ্ধ করবে না, সেজন্য অপর অঞ্চলটিকে বলা হয় অবাঞ্ছিত অঞ্চল। নির্ণায়ক বিন্দুটি (0,0) বা অন্য কোন সুবিধামত বিন্দু হতে পারে, দেখতে হবে বিন্দুটি যেন সংশ্লিষ্ট সরলরেখার ওপর না হয়। দুটি অঞ্চলের (বাঞ্ছিত এবং অবাঞ্ছিত) মধ্যে অনেক সম্বন্ধ আছে, যেমন দুটি অঞ্চলের দুটি বিন্দু সংযোজক সরলরেখা বা যে কোন রেখা অঞ্চল বিভাগকারী সরল রেখাকে ছেদ করতে বাধ্য। অপর পক্ষে, একই অঞ্চলের দুটি বিন্দু সংযোগকারী রেখাংশ উক্ত সরল রেখাকে আদৌ ছেদ করবে না। এখন সমস্যা হলো কি ভাবে বাঞ্ছিত অঞ্চলটি লেখপত্রে নির্দেশিত হবে। বিভিন্ন উপায়ে বাঞ্ছিত অঞ্চলকে নির্দেশ করার কৌশল আছে। সবচেয়ে প্রচলিত প্রথা হলো, একপ্রান্তে তীর চিহ্ন যুক্ত সমান্তরাল সরলরেখা সমূহদ্বারা বাঞ্ছিত অঞ্চলটি দেখানো। যদি আলোচ্য অসমীকরণে সমতা চিহ্ন ($ax + by + c \leqslant 0$ বা $ax + by + c \geqslant 0$) থাকে তবে সমান্তরাল রেখাসমূহ অক্ষতল (লেখপত্র) বিভাজক রেখাটিকে ($ax + by + c = 0$) স্পর্শ করবে, নচেৎ নয়; এই বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ অন্যথায় কিছু নম্বর কেটে নেওয়ার নির্দেশ থাকে। ভাল হয় বাঞ্ছিত অঞ্চলটি চিত্রে উল্লেখ করা এবং সংশ্লিষ্ট অসমীকরণটি অঞ্চলে লিখে দেওয়া। মোট কথা পরীক্ষক যেন লেখচিত্র দেখে সহজেই বুঝতে পারেন পরীক্ষার্থীর অভিপ্রায় কি। অভিপ্রায় অনির্দিষ্ট হলে পরীক্ষক সেক্ষেত্রে কোন নম্বরই দেন না। মাধ্যমিক পরীক্ষায় প্রশ্নপত্রে দুটি অসমীকরণের লেখচিত্র অঙ্কনের নির্দেশ থাকে। উত্তরে দুটি অসমীকরণের বাঞ্ছিত অঞ্চল আলাদা করে চাওয়া হয়, না দুটি বাঞ্ছিত অঞ্চলের কেবলমাত্র মধ্যকার (সাধারণ) অঞ্চলটি চাওয়া হয় তা স্পষ্ট করে বোঝা যায় না। সাধারণতঃ দুটি অসমীকরণ একত্র নির্দেশিত হলে, উভয় অসমীকরণকে সিদ্ধ করে এমন (সমাধান) অঞ্চলই বোঝায়। সেক্ষেত্রে অসমীকরণদ্বয়ের বাঞ্ছিত অঞ্চল দুটি পৃথক না দেখিয়ে সরাসরি তাদের সাধারণ বা উভনিষ্ঠ অঞ্চলটি চিত্রিত করা যেতে পারে। তাই সংশয়ের মধ্যে না গিয়ে একই লেখপত্রে দুটি অসমীকরণের লেখচিত্র স্বতন্ত্র ভাবে অঙ্কন করা সমীচীন এবং উক্ত অঞ্চলদ্বয় নির্দেশক সংকেত রেখাসমূহ এমন ধরনের হওয়া উচিত যেন সর্বশেষ সাধারণ অঞ্চলটি পরিস্ফুট হয়। সরাসরি সাধারণ অঞ্চলটি নির্দেশ না করে সংশ্লিষ্ট বাঞ্ছিত অঞ্চল দুটি পৃথকভাবে নির্দেশ করার একটি সার্থকতা আছে। যদি কোনক্রমে দুটির মধ্যে

একটি বাঞ্ছিত অঞ্চল ভুল হয়, তাহলে অপর সঠিক অঞ্চলের জন্য বণ্টিত নম্বর পরীক্ষার্থী পেয়ে থাকে, যদিও সেক্ষেত্রে সাধারণ অঞ্চলটি যথার্থ নয়। সমগ্র লেখচিত্রটি যাতে সদৃশ্য এবং পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হয় তার প্রতি পরীক্ষার্থীর বিশেষভাবে যত্নবান হওয়া উচিত।

পরিশেষে উদাহরণ সহযোগে অসমীকরণের লেখচিত্র অঙ্কন পদ্ধতি বর্ণনা করা হবে। প্রথমে প্রশ্নানুসারে সমীরকণ দুটিকে $y \lesseqgtr mx+c$ এবং $x \lesseqgtr ky+d$ আকারে পর্যবসিত করা হবে এবং সংশ্লিষ্ট জুটি সমূহ নির্ণয় করা হবে। পূর্বেই বলা হয়েছে যে এই সব গণনা খাতার বাঁ পৃষ্ঠায় থাকবে এবং লেখপত্র আঁকান হবে তারই ডান দিকে, যেন পরীক্ষকের পক্ষে লেখচিত্র যাচাই করে নিতে কোন অসুবিধা না হয়।

প্রশ্নঃ—নিম্নলিখিত অসমীকরণদ্বয়ের লেখচিত্র অঙ্কন কর

$3x-2y \geqslant 12$ এবং $3x-5y < 15$

উত্তর—প্রথম অসমীকরণ থেকে $-2y \geqslant 12-3x$

বা $y \leqslant \frac{3x-12}{2}$ [-2 দ্বারা উভয়পক্ষকে ভাগ করার জন্য অসমীকরণ চিহ্ন উল্টে গেল]

ধরি $x=-2$, $y \leqslant \frac{3(-2)-12}{2} = -9$,

„ $x=0$, $y \leqslant \frac{3(0)-12}{2} = -6$,

„ $x=4$, $y \leqslant \frac{3(4)-12}{2} = 0$,

সংশ্লিষ্ট ছক—

x	−2	0	4
y⩽	−9	−6	0

দ্বিতীয় সমীকরণ থেকে $3x < 15+5y$

বা, $< \frac{15+5y}{3}$

ধরি $y=3$, $x < \frac{15+5(3)}{3} = 10$,

„ $y=0$, $x < \frac{15+5(0)}{3} = 5$,

„ $y=-3$, $x < \frac{15+5(-3)}{3} = 0$,

সংশ্লিষ্ট ছক—

x<	10	5	0
y	3	0	−3

লক্ষণীয় যে উপরের দৃষ্টান্তে একটি অসমীকরণের সমতা চিহ্ন নেই। স্মরণ রাখা চাই যে একটি অসমীকরণের লেখচিত্র অঙ্কনের কাজ সম্পূর্ণ সমাধা করার পর অপর সমীকরণটির কাজ শুরু করা উচিত। পুনরুল্লেখে দোষ

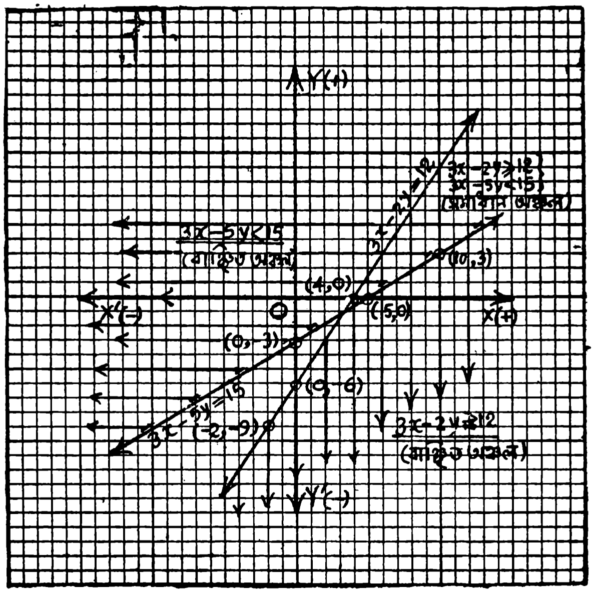

চিত্র—২

নেই, আলোচ্য লেখচিত্র অঙ্কন পদ্ধতি সম্বন্ধে কোন ব্যাখ্যা উত্তরে নিষ্প্রয়োজন। তাই পরীক্ষা কক্ষে অথবা সময় নষ্ট নয় করে অন্যান্য প্রশ্নের উত্তরদানের জন্য পরীক্ষার্থীর মনোযোগী হওয়া সমীচীন।

অসীম মুখোপাধ্যায়, ২৮/৪/২/১বি, শ্রীমোহন লেন
কলিকাতা-৭০০০২৬

বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান রচনার অগ্রপথিক
গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্যের সাম্প্রতিক গ্রন্থ
পশু-পাখী কীট-পতঙ্গ
প্রকাশিত হয়েছে ॥ দাম ৮·০০
শৈব্যা ● প্রকাশন বিভাগ ৮/১সি শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩

অজানা মহাকাশে
১৬
অল্পসময়ের মধ্যেই বীভৎস ভয়ঙ্কর প্রাণীরা শহরে ঢুকতে শুরু করলো।
কিন্তু প্রাণীগুলোকে প্রতিরোধ করা সহজ হোলনা।
এমার্জেন্সী! বেড়া সারাই প্রয়োজন, রক্ষীরা রাস্তায় ছড়িয়ে পড়।
শহরের সবাই ভয়ে দিশাহারা।
ব্রেন এগিয়ে চললো বন্দীনিবাসের দিকে।
আমার লোকেদের আগে উদ্ধার করতে হবে।
বন্দী নিবাস
দরজা উড়িয়ে দাও।
ব্লাস্টার তুলে নাও!
এবার আমরা কন্ট্রোল সেন্টার দখল করবো।
কোথায় কি আছে কি করে জানবো?
আমি সব দেখেছি। সামনেই কন্ট্রোল রুম, দরজা ভেঙে ঢুকবো!

অংকে পাশ নম্বর পেতে হলে ● শুভঙ্কর ব্যানার্জী

অংক সম্বন্ধে অধিকাংশ ছাত্রছাত্রীদের একটি ভীতি আছে! এর প্রধান কারণ সাহিত্যের মত অংকেরও যে রস আছে তা সেই সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীরা পায় না। তাই তাদের নিকট অংক নিরস মনে হয়।

অংকের ভীতি কাটিয়ে উঠতে হলে প্রথমেই জানা চাই অংকের ধারাবাহিকতা এবং সাথে সাথে চালাতে হবে অনুশীলন। একটা উদাহরণ দিলে তোমাদের কাছে বিষয়টা পরিষ্কার হয়ে যাবে। সপ্তম শ্রেণীতে $(a+b)^2$ সূত্র তোমরা মুখস্থ কর, পরবর্তী অষ্টম, নবম, এমনকি দশম শ্রেণীতেও তার প্রয়োগ দেখা যায়। যেমন টেস্ট পেপার খুললে শেষের দিকে দেখতে পাবে—

$X+\frac{1}{x}=5$ হলে $X^2+\frac{1}{x^2}$ এর মান নির্ণয় কর ঃ

অথবা অষ্টম শ্রেণীতে $(a+b)^2$ তোমরা পড়ছে। তার প্রয়োগ টেস্ট পেপারে দেখা যায় যেমন—

$(a+\frac{1^2}{a})=3$ হলে $a^3+\frac{1}{a^3}$ এর মান নির্ণয় কর।

সপ্তম শ্রেণীতে তোমরা সুদের অংক করেছো এবং বীজগণিতের সমীকরণ করেছো। এই দুই-এর সমন্বয়ে দশম শ্রেণীর সুদের অংক অনায়াসে সমাধান করা যায়।

তাহলে দেখতে পেলে যে অংকের ধারাবাহিকতা সম্বন্ধে সঠিক জ্ঞান থাকলে অংকের ভীতি কেটে যায়।

নিজেরা এবার ভেবে দেখতো আমি ঠিক বললাম কি না! যদি বোঝ ঠিক বলেই থাকি তবে ষষ্ঠ শ্রেণীর শতকরার সংগে নবম শ্রেণীর শতকরার মিল তোমরা নিজেরাই বের কর।

যাক এবার আসল শিরোনামে আসা যাক।

বহু পত্রিকায় তোমরা পড়েছো অংকে কি করে বেশী নম্বর পাওয়া যায়। কিন্তু আজ আমি লিখছি তাদের জন্য যারা অংকে শুধু মাত্র সহজে পাশ করতে চায়। আমি শিক্ষক হিসাবে আমার বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে দেখেছি যে এদের সংখ্যাই মোট পরীক্ষার্থীর শতকরা ষাট ভাগ, বহুদিন ধরেই এদের জন্য লিখবো ভাবছি কিন্তু সেই রকম সুযোগ পাই নি। শোন কি করে সহজে অংকে 40 নম্বর পাওয়া যায় সেই কথাই বলছি।

সামনে টেস্ট পেপার নিয়ে বস, তাহলে আমার কথা-বলতে সুবিধে হবে।

তোমরা নিশ্চয়ই জান অংকের 100 নম্বর প্রশ্নের দুইটি অংশ। একটি "Objective"—যে অংশটুকু খাতার সাথে দিয়ে দিতে হয়। ওতে থাকে 16 নম্বর, টেস্ট পেপারের পরপর দশটা প্রশ্নের "Objective" অংশ সমাধান করলে ঐ অংশে 6 নম্বর অবশ্যই পাওয়া যায়। আমি আমার ছাত্রছাত্রীদের এই নিয়মে করিয়ে বিশেষ ফল পেয়েছি।

সপ্তম শ্রেণী থেকে উৎপাদক এবং সমাধান তোমরা দশম শ্রেণী পর্যন্ত করে আসছ। সুতরাং বই বা টেস্ট পেপার থেকে বেশ কিছু উৎপাদক এবং সমাধান করলে অনায়াসে $6+6=12$ নম্বর পাওয়া যায়। যারা উৎপাদক পারবে না তারা ল. সা. গু. বা গ. সা.গু করবে।

সমীকরণ ও অসমীকরণের লেখচিত্র টেস্ট পেপার থেকে 20টা করে যদি কর তবে তার থেকে $6+7=13$ পাওয়া খুবই সহজ হবে। তবে লেখচিত্র অংকনের সময়—অক্ষদ্বয় ঠিকমত দেখিয়ে দিতে হবে এবং অন্ততঃ সঠিক তিনটি বিন্দু বের করতে হবে।

পাটীগণিতে সুদকষার অংকটি বীজগণিতের নিয়মে সহজেই সমাধান করা যায় যা তোমরা এই পত্রিকা মারফৎ জেনেছো। সুতরাং ঐ অংকে 7 পাওয়া খুবই সোজা।

তোমাদের সিলেবাসে সম্পাদ্য আছে দুটি। তারমধ্যে বহুভুজের সমান ত্রিভুজ অংকণ সাধারণতঃ আসে না। সুতরাং ওটি বাদ দিলে থাকে পাঁচটি। ঐ পাঁচটি সম্পাদ্য ভালভাবে শিখলে অনায়াসে ৪টি নম্বর পাওয়া যায়।

তাহলে মোট নম্বর হল ঃ—

Objective	= 6
উৎপাদক বা ল. সা. গু. বা গ. সা. গু	= 6
সমাধান	= 6
লেখচিত্র	= 13
সুদ	= 7
সম্পাদ্য	= 8
	46

এছাড়া যদি উপপাদ্যগুলির বা অতিরিক্ত জ্যামিতির চিত্র সঠিক এঁকে দিতে পার তাহলে প্রতিটিতে 1 করে পেতে পার।

তবে উপরোক্ত নম্বর পেতে হলে নির্দিষ্ট অংকগুলি খুব বেশী করে অনুশীলন করতে হবে যাতে প্রশ্নকর্তা অন্ততঃ উপরোক্ত অংকগুলিতে তোমায় হারিয়ে না দিতে পারেন।

এবার একাএকা বসে ভেবে দেখতো, মাধ্যমিক পরীক্ষায় অংকে 40 পাওয়া কি খুবই শক্ত?

আমার কথাগুলি যদি ভালো লেগে থাকে তবে আজই উপরোক্ত নিয়মে অংক কষতে শুরু কর, দেখবে ফাইনালে ভাল ফল পাবেই।

বৈদ্যনাথ ইনস্‌টিটিউশন, দমদম ক্যাণ্ট। কলি ঃ—৬৫

১৯৮২—মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের জন্য

জীবনবিজ্ঞানের আলোচনা

তারক মোহন দাস

জীবনবিজ্ঞান মাধ্যমিক শিক্ষাসূচীতে অন্তর্ভুক্ত হবার পর প্রথম কয়েক বছর ধরে যে সিলেবাস অনুযায়ী পড়ান হয়েছিল তা বর্তমানে পরিবর্তিত হয়েছে। ১৯৮০ সাল থেকে মাধ্যমিক পরীক্ষা নূতন সিলেবাস অনুযায়ী হচ্ছে। এ বছরও তাই হবে। সুতরাং, আগের প্রশ্নপত্র বা পাঠ্য পুস্তকের মধ্যে এমন অনেক কিছু থাকতে পারে যা বর্তমান সিলেবাসের বাইরে। ঠিক তেমনিই গত দু-বছরের প্রশ্নপত্র ও নূতন পাঠ্য পুস্তকের মধ্যে এমন অনেক কিছু আছে যা পুরাণ প্রশ্নপত্র বা বই-এর মধ্যে নেই। সুতরাং, পরীক্ষার প্রস্তুতির জন্য বর্তমান সিলেবাস সম্পর্কে ভাল ভাবে অবহিত হওয়া দরকার।

জীবনবিজ্ঞান এমনই একটি বিষয় যেখানে মুখস্থ করবার অবকাশ খুবই কম। বর্তমানে প্রশ্নপত্র এমন ভাবে করা হচ্ছে—যারা বিষয়টি ভালভাবে বুঝেছে এবং নিজের কথায় সংক্ষিপ্ত ও সঠিক উত্তরটি দিতে সমর্থ তারা যেন ভাল রেজাল্ট করবার সুযোগ পায়। সুতরাং পরীক্ষায় ভাল করতে হলে বিষয়টি প্রথমে ভাল করে বুঝতে হবে তারপর অল্প কথায় সঠিক উত্তরটি দিতে হবে। গত দু-বছরের প্রশ্নপত্র মিলিয়ে দেখলেই একথার যথার্থতা বোঝা যাবে।

পরীক্ষার্থীদের কাছে আমাদের প্রথম অনুরোধ হল তারা পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ নবম ও দশম শ্রেণীর জীবনবিজ্ঞানের যে গাইড-লাইন দিয়েছে তা যেন বার বার করে পড়ে দেখে। একথা বলবার কারণ গত দু-বছর ধরে জীবনবিজ্ঞানের সকল প্রশ্ন ঐ গাইড-লাইনের ভেতর থেকেই আসছে। অধিকাংশ পাঠ্যপুস্তকের প্রথমেই ঐ গাইড-লাইন দেওয়া আছে।

আমাদের দ্বিতীয় অনুরোধ পরীক্ষার্থীরা যেন বাংলায় লেখা প্রশ্নপত্রটি পড়বার সঙ্গে সঙ্গে ইংরাজীতে লেখা প্রশ্নপত্রটিও একবার মিলিয়ে দেখে। তাতে প্রশ্নগুলি বোঝবার সুবিধা হবে, অনেক ভুল বোঝাবুঝির অবসান হবে। প্রশ্নপত্রে অনেক সময় এমন অনেক বাংলা বৈজ্ঞানিক শব্দ আসে যা সাধারণ পাঠ্য পুস্তকে খুঁজে পাওয়া যায় না, তার ইংরাজী প্রতিশব্দটি এখানে সাহায্য করতে পারে। ১৯৭৬ সালে প্রশ্ন এসেছিল সঞ্চালন ও চলনে প্রভেদ কি? অধিকাংশ পাঠ্যপুস্তকে আছে চলন ও গমনের কথা, সঞ্চালন শব্দটি কোথাও নেই, তাই সঠিক উত্তরটি জানা সত্ত্বেও অধিকাংশ পরীক্ষার্থী ঐ প্রশ্নের উত্তর করতে পারে নি। কিন্তু যারা ইংরাজী প্রতিশব্দটি দেখে নিয়েছিল তাদের উত্তর করতে কোন অসুবিধা হয় নি। ১৯৮১ সালের প্রশ্নপত্রে অবশ্য চলন গমন আবার ফিরে এসেছে। কিন্তু সেই সঙ্গে এসেছে নির্উক্লিয়ার ঝিল্লি। অনেক বই-এ ঝিল্লি নেই, সেখানে আছে পর্দা বা মেমব্রেন।

আমাদের তৃতীয় অনুরোধ হল প্রশ্নের উত্তর যথাসম্ভব সংক্ষিপ্ত, স্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন হওয়া দরকার। এ জন্য একাধিক পাঠ্যপুস্তক পড়ে মূল বিষয়টি প্রথমে ভালভাবে বোঝা দরকার। জীবনবিজ্ঞানের পাঠক্রম যখন প্রথম প্রচলিত হয়েছিল তখন এ নিয়ে অনেক পাঠ্য পুস্তক লেখা হয়েছিল যা অত্যন্ত জটিল ও অনাবশ্যক ও অতিরিক্ত তথ্যের ভারে ভারাক্রান্ত, যা পড়ে ছাত্রছাত্রীরা আসল বা মূল বিষয়টিই বুঝতে সমর্থ হচ্ছিল না। এই সিলেবাস পরিবর্তনের অন্যতম কারণই হল কিছুটা অতিরিক্ত বোঝা হাল্কা করা এবং পাঠ্য পুস্তকগুলির মধ্যে একটা সমতা আনা (এই প্রচেষ্টা কতদূর সফল হয়েছে সে বিষয়ে অবশ্য যথেষ্ট সন্দেহ আছে।) সুতরাং কোন বই-এ কোন বিষয় যদি যথেষ্ট সরল করে না লেখা থাকে তাহলে একাধিক বই পড়লে এবং বিভিন্ন দিক থেকে বিষয়টি আলোচনা করলে সে অসুবিধা দূর হতে পারে। না বুঝে কোন কিছু মুখস্থ করা নিছক পণ্ডশ্রম ছাড়া আর কিছুই নয়। সরল ভাষায় সঠিকভাবে মূল বিষয়টি জানার মধ্যেই বিজ্ঞান শিক্ষার সাফল্য নির্ভর করছে। মূল বিষয়টি না জেনে, না বুঝে যদি কিছু সংজ্ঞা, কিছু প্রশ্ন-উত্তর জাতীয় খেলা অথবা জটিল কিছু বিষয় মুখস্থ করতে যাই তাহলে ফল মারাত্মক হতে পারে।

সারাবিশ্বে জীবনবিজ্ঞানের আর একটি ভাষা হল 'ছবি'। আমাদের চতুর্থ অনুরোধ হল পরীক্ষার্থীরা যখন সুযোগ পাবে তখনই ভাষা ছাড়াও ছবি এঁকে বিষয়টি বোঝাবার চেষ্টা করবে। যেখানে ছবি আঁকার নির্দেশ নেই সেখানেও ছবি আঁকা উচিত, ভাষার ত্রুটি ছবি সংশোধন করবে। ছবি সব সময় লেবেল করতে হবে। বিজ্ঞানে লেবেল ছাড়া ছবির কোন মূল্য নেই। পার্থক্য বোঝাবার জন্য রঙীন সাইন পেন ব্যবহার করা চলতে পারে।

আমাদের পঞ্চম অনুরোধ হল প্রশ্নপত্রের এক নম্বর প্রশ্নটি সম্পর্কে। এই এক নম্বর প্রশ্নে ছোট ছোট

১৫-২০টি প্রশ্ন থাকে প্রশ্নগুলি সব Compulsory এবং প্রশ্ন পত্রেই ওপর তার ছোট ছোট উত্তর লিখে প্রশ্ন পত্রটি বাড়ার সঙ্গে জুড়ে দিতে হয়। বরাবরই লক্ষ্য করা যাচ্ছে এখানে এমন কিছু প্রশ্ন আসছে যা ষষ্ঠ, সপ্তম অথবা অষ্টম শ্রেণীতে পড়ান হয়েছে—যেমন কোষের বিভিন্ন অংশ সম্পর্কে, কলা সম্পর্কে, উদ্ভিদ ও প্রাণীর দেহ বৈশিষ্ট্য বা আচরণ সম্পর্কে, ভারতের জাতীয় পুষ্প, পশু বা পাখী সম্পর্কে। সুতরাং পরীক্ষায় যারা ভাল করতে চাও তারা ষষ্ঠ, সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণীর জীবন-বিজ্ঞানের বইগুলিও একবার দেখে নিও। বিশেষ করে পরিবেশের উপাদান, সজীব-পদার্থের বৈশিষ্ট্য, কোষ-কলার গঠন, ফুল-ফলের বৈশিষ্ট্য, ও ব্যাপন, অভিস্রবণ, শোষণ পরিবহণ, প্রস্বেদন প্রভৃতির সংজ্ঞা, ইত্যাদি।

আমাদের সর্বশেষ অনুরোধ হল হস্তাক্ষর যেন সব সময়। স্পষ্ট ও পরিষ্কার হয়। অপরিচ্ছন্ন লেখা পরীক্ষকের মনে সব সময়ই একটা বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে থাকে। বাংলা বৈজ্ঞানিক শব্দের পাশে ব্র্যাকেটে ইংরাজী শব্দটি লিখে দিলে ভাল হয়, পরীক্ষকের তাতে সুবিধা হয় এবং খাতা জমা দেবার আগে গোড়া থেকে উত্তর-গুলি পড়ে, ভুল-ত্রুটি থাকাল সেগুলি সংশোধন করে তা জমা দেওয়া উচিত। পরীক্ষার্থীদের কাছে এটা আনন্দের কথা গত দু-বছর ধরে জীবনবিজ্ঞানের প্রশ্ন সহজ হচ্ছে, খুব সোজা হচ্ছে। আশা করি এবছরও তার ব্যতিক্রম হবে না।

মাধ্যমিক জীবন-বিজ্ঞানের সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

শ্রীদিনোজকুমার দে

মাধ্যমিক ফাইন্যাল পরীক্ষা তো আর প্রায় এসে গেল। আশা করি সবাই ভালভাবে তৈরী হ'চ্ছো। তাই তোমাদের জন্য জীবনবিজ্ঞানের কিছু সম্ভাব্য প্রশ্ন দিলাম। যদিও বর্তমানে যে ধরনের প্রশ্ন আসছে তাতে ক'রে প্রশ্ন অনুমান করা খুবই কঠিন। তৎসত্ত্বেও বিগত কয়েক বৎসরের মাধ্যমিক শেষ পরীক্ষায় দেওয়া প্রশ্নের পরিপ্রেক্ষিতে এই প্রশ্নগুলি তৈরী করো। যারা ফল ভাল করতে চাও তারা সব প্রশ্নের উত্তর তো করবেই তাছাড়া নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর বিশেষ মনোযোগের সহিত করবে। পরিশেষে আর একটা কথা বলি সব সময় চেষ্টা করবে চিত্রসহ উত্তর লিখতে।

১। সালোকসংশ্লেষ কাহাকে বলে? সালোকসংশ্লেষকে অঙ্গার আত্তীকরণ পদ্ধতি বলা হয় কেন? এই ঘটনাটি সংক্ষেপে বর্ণনা কর। সালোকসংশ্লেষ দ্বারা জীব-জগৎ কি কি ভাবে উপকৃত হয়?

২। শ্বসনের সংজ্ঞা দাও। শ্বসনের তাৎপর্য কি? অবাত শ্বসন ও কোহল সন্ধানের মধ্যে পার্থক্য কি? প্রাণিদেহে কি কি শ্বাসঅঙ্গ দেখা যায়?

৩। ম্যাক্রো এলিমেন্ট ও মাইক্রো এলিমেন্ট বলিতে কি বুঝ? উদাহরণ দাও। উৎসেচক কাহাকে বলে? উৎসেচকের ধর্মগুলি কি কি? অ্যাপো ও কো এনজাইম বলিতে কি বুঝ? প্রোটিন ও ফ্যাট জাতীয় খাদ্য প্রাণি-দেহে কিভাবে পরিপাক হয় বর্ণনা কর। উদ্ভিদ পুষ্টি ও প্রাণিপুষ্টির মধ্যে প্রধান পার্থক্যগুলি কি কি?

৪। উদ্ভিদ ও প্রাণি সংবহনের প্রধান পার্থক্য কি? উন্নত শ্রেণীর উদ্ভিদে কিভাবে সংবহন সংঘটিত হয় লিখ।

৫। রক্ত কি? রক্তের উপাদান কি কি? রক্তের কাজগুলি কি কি? কিসের উপর ভিত্তি করিয়া রক্তের শ্রেণী বিভাগ করা হয়? রক্ত তঞ্চন প্রক্রিয়াটি বর্ণনা কর। সর্বজনদাতা ও সর্বজনগ্রহীতা বলিতে কি বুঝ? বদ্ধ ও যুক্ত সংবহনের মধ্যে পার্থক্য কি?

৬। অ্যামিবা, মাছ ও আরশোলার গমন পদ্ধতি বর্ণনা কর। সিলিয়া ও ক্ষণপদের সাহায্যে গমন করে এমন দুটি উদ্ভিদের নাম কর। গমনে অক্ষম এমন দুটি প্রাণীর নাম কর।

৭। রেচনের সংজ্ঞা লিখ। উদ্ভিদের রেচন পদার্থ-গুলি কি কি? উদ্ভিদের রেচনের কৌশল বর্ণনা কর। উদ্ভিদের রেচন পদার্থ প্রাণিদের কিভাবে কাজে লাগে বুঝাইয়া দাও।

৮। অ্যামিবা, কৃমি, কেঁচো, পতঙ্গজাতীয় প্রাণিদের রেচন অঙ্গের নাম কর। রেচনের গুরুত্ব কি?

৯। মাটি কিভাবে উৎপত্তি লাভ করে? মাটির শ্রেণীগুলির নাম উল্লেখ করে উহাদের সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা কর।

১০। ব্যাকটেরিয়ার গঠন ও জনন-প্রক্রিয়া বর্ণনা কর। ব্যাকটেরিয়ার উপকারী ও অপকারী ভূমিকা আলোচনা কর। ভাইরাসের বৈশিষ্ট্য কি?

১১। ক) মস্তিষ্ক ছাড়া মানুষের অন্য ভারসাম্য

রক্ষাকারী অঙ্গের গঠন বর্ণনা কর এবং কাজ উল্লেখ কর।

খ) মস্তিষ্কের গঠন বর্ণনা কর এবং প্রতিটি অংশের কাজ উল্লেখ কর।

১২। ক) হরমোনকে রাসায়নিক দূত বলা হয় কেন? উদ্ভিদ হরমোনগুলি কি কি? কৃষিকাজে হরমোনের ভূমিকা উল্লেখ কর।

খ) মানবদেহে অন্তঃক্ষরা গ্রন্থিগুলি কি কি? উহা হইতে কোন কোন হরমোন নিঃসৃত হয়? উহাদের কাজ কি? হরমোন ও এনজাইমের মধ্যে পার্থক্য কি?

১৩। মাইটোসিসকে সমবিভাজন ও মায়োসিসকে হ্রাস বিভাজন বলা হয় কেন? উভয় প্রকার কোষ বিভাজনের তাৎপর্য উল্লেখ কর। মাইটোসিস ও মায়োসিসের পার্থক্য কি?

১৪। ক) সপুষ্পক উদ্ভিদের যৌন জনন-ক্রিয়া বর্ণনা কর।

খ) অযৌন জনন ও যৌন জননের পার্থক্য কি? উদ্ভিদের বিভিন্ন প্রকার অযৌন জননের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

১৫। বংশগতির জনক কাহাকে বলে? সংকর ও খাঁটি বলিতে কি বুঝ? বংশগতিতে 3:1 এবং 1:2:2 অনুপাতকে কি বলে?

১৬। জীব অভিব্যক্তি বলিতে কি বুঝ? জীবনের উৎপত্তি সংক্ষেপে আলোচনা কর। অভিব্যক্তির স্বপক্ষে তিনটি প্রমাণ সম্বন্ধে আলোচনা কর। ডারউইনের মতবাদ সংক্ষেপে আলোচনা কর।

১৭। নিম্নলিখিত উদ্ভিদ ও প্রাণিগুলির বিশেষ অভিযোজন উল্লেখ কর:—

ক) পদ্ম খ) ক্যাকটাস গ) মাছ।

১৮। বাতাসে কার্বন ডাই-অক্সাইড ও অক্সিজেনের পরিমাণ কিভাবে ঠিক থাকে তাহা বুঝিয়ে দাও।

১৯। ইকোসিস্টেম কাকে বলে? খাদ্য পিরামিড কি? ইকোসিস্টেমে বিয়োজক, উৎপাদক ও বিভিন্ন শ্রেণীর খাদকের ভূমিকা কি? একটি পুকুরের ইকোসিস্টেম বর্ণনা কর। ইকোসিস্টেমে প্রবাহিত শক্তির উৎস কি?

২০। সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা কি? ভূমি, বনভূমি, বন্যপ্রাণী ও পরিবেশ সংরক্ষণের উপায়গুলি কি কি?

চিত্র অঙ্কন করে প্রতিটি অংশ চিহ্নিত কর:—

১। ব্যাঙের পৌষ্টিক তন্ত্র, ২। মানুষের শ্বাসতন্ত্র,
৩। ব্যাঙের হৃৎপিণ্ডের লম্বচ্ছেদ, ৪। বৃক্কের অন্তর্গঠন,
৫। নিউরোন, ৬। কর্ণের অন্তর্গঠন।

পার্থক্য লিখ:—

(ক) সালোকসংশ্লেষ ও শ্বাসকার্য (খ) অন্তঃশ্বসন ও বহিঃশ্বসন (গ) উপচিতি ও অপচিতি (ঘ) উদ্ভিদ পুষ্টি ও প্রাণিপুষ্টি। (ঙ) মানুষের রক্ত ও ব্যাঙের রক্ত। (চ) শিরা ও ধমনী (ছ) ভাইরাস ও ব্যাক্টেরিয়া (জ) ম্যালপিজিয়ান টিবিউল ও ম্যালপিজিয়ান করপাসল (ঝ) প্রবল ও অপ্রবল গুণ।

১০৫, সতীন সেন সরণী, কলি-৫৪

পড়াশোনা

ভৌত বিজ্ঞানের সম্ভাব্য প্রশ্ন : মাধ্যমিক পরীক্ষা ১৯৮২

অমরনাথ রায়

ভৌত বিজ্ঞানের প্রশ্নের উত্তর লিখবার
সময় মনে রাখবে:

1. অঙ্ক কষতে হলে উত্তর এর পাশে **একক লিখতে হবে।**

2. আলোর প্রতিফলন অথবা প্রতিসরণ সম্পর্কিত কোন চিত্র আঁকতে হ'লে **তীর চিহ্ন দিয়ে আলোর গতিপথ দেখাতে হবে।**

3. যে কোন চিত্র আঁকলেই তা **লেবেল যুক্ত চিত্র** (labelled diagram) হওয়া চাই।

4. কোনও রাসায়নিক বিক্রিয়ার সমীকরণ লিখলে সেটি অবশ্যই **সমসমঞ্জস সমীকরণ (balancee equation) হওয়া চাই।**

5. খুব ছোট প্রশ্নের উত্তর লিখলেও তা যেন সম্পূর্ণ বাক্যে লেখা উত্তর হয়। যদি প্রশ্ন করা হয়: "কোন্ যৌগ ঊর্ধপাতিত হয়?" তোমার উত্তর হবে: কর্পূর কিংবা আয়োডিন ঊর্ধপাতিত হয়।

লক্ষ্য কর, উত্তরটা সম্পূর্ণ বাক্যে লেখা হয়েছে।

6. **যে কোন প্রশ্নের উত্তরই সংক্ষিপ্ত এবং to the point হওয়া চাই।** মনে রেখ—বেশী লিখলেই বেশী নম্বর পাওয়া যায় না।

7. **হাতের লেখা যতদূর সম্ভব পরিচ্ছন্ন হওয়া দরকার।** বড় বড় হরফে দুটি লাইনের মাঝে ফাঁক রেখে লিখবে। খাতার প্রতিটি পাতার বাঁ দিকে ইঞ্চি খানেক জায়গা মার্জিন রাখবে।

8. **পরীক্ষা দিতে যাওয়ার সময় অতি অবশ্য**

Instrument Box সঙ্গে করে নিয়ে যাবে। **কোন চিত্র অাঁকবার দরকার হতো পেন্সিলে অাঁকবে।** প্রয়োজন হলে রবার দিয়ে অবাঞ্ছিত দাগ মুছে—যতদূর সম্ভব পরিচ্ছন্ন চিত্র অাঁকবে। দরকার হলে স্কেল, কম্প্যাস ইত্যাদি ব্যবহার করবে।

9. যে প্রশ্নের উত্তর সবচেয়ে ভাল জানা আছে সেইটা আগে লিখবে। যে সব প্রশ্নের উত্তর লিখবার জন্যে তোমাকে ভাবতে হবে, সেগুলি পরে ভেবে লিখবে।

10. প্রতিটি বিভাগ থেকে যে কয়টি প্রশ্নের উত্তর লিখতে বলা হয়েছে—**খেয়াল রেখো, তোমার উত্তর যেন তার থেকে বেশী বা কম না হয়।**

(ক) বিভাগ

1. ভার ও ভরের মধ্যে পার্থক্য কি? পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে বস্তুর ভর ও ভারের কি রকম পরিবর্তন হয়? কোন্ কোন্ যন্ত্র দ্বারা ভর ও ভার মাপা হয়? মাপনী চোঙ দ্বারা কিভাবে কঠিন বস্তুর আয়তন মাপা যায়?

2. পদার্থের গলনাঙ্ক ও তরলের স্ফুটনাঙ্কের সংজ্ঞা লেখ। 'প্রেসার কুকার' এর কার্যপ্রণালী বুঝিয়ে দাও। চাপ বাড়ালে বরফের গলনাঙ্ক কি ভাবে প্রভাবিত হয়? 'বরফ গলনের লীন তাপ ৪0 ক্যালোরি প্রতি গ্রামে'—এ কথার অর্থ কি?

3. তাপ ও উষ্ণতার মধ্যে প্রভেদ কি? '—40°C' = কতো ডিগ্রি ফারেনহাইট? তামার আপেক্ষিক তাপ 0·09 বলতে কি বোঝ? থার্মোমিটারের সেলসিয়াস স্কেলে ঊর্ধ্ব ও নিম্ন স্থিরাঙ্ক কতো? 'ক্যালোরি' কিসের একক? উহার সংজ্ঞা লেখ। 'তাপের যান্ত্রিক তুল্যাংক' বলতে কি বোঝ?

4. 'কার্য' বলতে কি বোঝ? বলের বিরুদ্ধে কার্যের একটি উদাহরণ দাও। সি. জি. এস এবং এফ. পি. এস. পদ্ধতিতে কার্যের চরম ও ব্যবহারিক এককের নাম কি?

5. 'শক্তি' কাকে বলে? গতিশক্তি ও স্থিতিশক্তির একটি করে উদাহরণ দাও। একটি ঘড়িতে চাবি দেবার পর ঘড়িতে কি প্রকার শক্তি সঞ্চিত হয়? m ভরসম্পন্ন একটি বস্তুকণা V গতিবেগে চললে বস্তুটির গতিশক্তির পরিমাণ কতো হবে?

6. ক্ষমতার সংজ্ঞা লেখ। সি. জি. এস এবং এফ. পি. এস পদ্ধতিতে ক্ষমতার ব্যবহারিক একক কি? 'এক অশ্বক্ষমতা' বলতে কি বোঝ? 'জাড্য' কাকে বলে ও কয় প্রকার, তাহা উদাহরণ সহযোগে ব্যাখ্যা কর।

7. দু' টুকরো বরফকে একত্রিত ক'রে খুব জোরে চাপ দেওয়া হলো। চাপ ছেড়ে দিলে কি দেখা যাবে? কেন? মাটির কলসীতে জল ঠাণ্ডা হয় কেন? পাহাড়ের উপরে রান্না করতে বেশী সময় লাগে কেন?

8. বয়েলের সূত্রটি লেখ। 'অ্যাভোগাড্রোর সংখ্যা' বলতে কি বোঝ? ঐ সংখ্যার মান কতো? প্রমাণ চাপ ও উষ্ণতা বলতে কি বোঝ? 27°C = কতো ডিগ্রী A? 'পরমশূন্য' কাকে বলে? কেন বলে? আণবিক গুরুত্বের সংজ্ঞা লেখ। ক্লোরিনের পারমাণবিক গুরুত্ব 35·5; এ কথার অর্থ কি?

9. গ্যাসের অণুগুলি কি সর্বদা স্থির থাকে? যদি না থাকে, তবে তাদের বেগ কখন বাড়ে? কোন্ উষ্ণতায় গ্যাসের অণুগুলি সম্পূর্ণরূপে গতিহীন হ'য়ে পড়ে? 'মোল' বলতে কি বোঝ?

10. শক্তির নিত্যতা সূত্রটি লেখ ও ব্যাখ্যা কর। স্টীম ইঞ্জিনে কোন্ শক্তিকে কোন্ শক্তিতে রূপান্তরিত করা হয়? ডায়নামোতে কোন্ শক্তি কোন্ শক্তিতে রূপান্তরিত হয়?

11. ইলেকট্রন, প্রোটন ও নিউট্রনের মধ্যে সবচেয়ে হাল্কা কোন্‌টি? হাইড্রোজেন পরমাণুর ভর প্রোটনের ভরের প্রায় সমান বলা হয় কেন? প্রোটন ও নিউট্রনের মধ্যে সাদৃশ্য কি, বৈসাদৃশ্যই বা কি? সোডিয়ামের পরমাণু ক্রমাঙ্ক 11 এবং ভর সংখ্যা 23, সোডিয়াম পরমাণুর গঠন প্রকৃতি কেমন?

12. ইউরেনিয়ামের একটি আইসোটোপের ভর সংখ্যা 238 এবং পরমাণু ক্রমাঙ্ক 92. উহার একটি পরমাণুতে ইলেকট্রন, প্রোটন ও নিউট্রন সংখ্যা কতো?

হাইড্রোজেনের ক'টি আইসোটোপ আছে? সাধারণ হাইড্রোজেন এবং ডয়টেরিয়ামের কেন্দ্রকগুলি কি কি কণিকা দ্বারা গঠিত? 'অক্সিজেনের ভর সংখ্যা 16'—এ কথার অর্থ কি? $_{17}Cl^{35}$ এর তাৎপর্য কি?

পরমাণুর মৌলিকত্ব কিসের উপর নির্ভর করে? নিষ্ক্রিয় গ্যাসের পরমাণুর গঠন বৈশিষ্ট্য কি?

(খ) বিভাগ

13. 'লিভার' কাকে বলে? দ্বিতীয় শ্রেণীর লিভারের সচিত্র বর্ণনা দাও। এই শ্রেণীর লিভারের যান্ত্রিক সুবিধা কেমন হয়? নিম্নলিখিতগুলির মধ্যে কোন্‌টি কোন্ শ্রেণীর লিভার তা কারণ সহ লেখ:

মানুষের হাত, নলকূপের হাতল, কাঁচি, জাঁতি, নৌকার দাঁড়। সাধারণ তুলাযন্ত্র, চিমটা, বেলচা।

14. নিউটনের গতিসূত্রগুলি লেখ। বন্দুক থেকে গুলি ছুঁড়লে বন্দুক তার ধারককে পিছনের দিকে ধাক্কা দেয় কেন? চলন্ত গাড়ী হঠাৎ ব্রেক কষলে যাত্রীরা

সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে কেন? 'ভরবেগ' বলতে কি বোঝ? 'নিউটন' কিসের একক? 25 গ্রাম ভরের একটি বস্তুর উপর বলপ্রয়োগ করায় বস্তুটিতে 10 সেমি./সেকেণ্ড² ত্বরণ সৃষ্টি হলো। বলের মান কতো হবে?

10. গ্রাম ভরের একটি বস্তুর উপর 20 ডাইন বল প্রয়োগ করায় বস্তুটি চলতে আরম্ভ করলো। বস্তুটির ত্বরণ কতো হলো?

15. 'আলোকের প্রতিফলন' কাকে বলে? আলোকের নিয়মিত প্রতিফলনের সূত্রগুলি লেখ। আলোকের 'বিক্ষিপ্ত প্রতিফলন' কাকে বলে? এই রকম প্রতিফলনের প্রয়োগ কিসে দেখা যায়?

16. সদবিম্ব ও অসদ্‌বিম্বের মধ্যে পার্থক্য কি? সমতল দর্পণ দ্বারা কোনও বিন্দু প্রভবের অসদবিম্ব গঠিত হয় কিভাবে, তা চিত্র এঁকে বোঝাও। উত্তল লেন্সের ফোকাসের সংজ্ঞা লেখ। কোনও বস্তু উত্তল লেন্স থেকে কতদূরে রাখলে তার প্রতিবিম্ব অসদ হবে? এই প্রতিবিম্ব বস্তু অপেক্ষা ছোট না বড় হবে? উত্তল লেন্সের দু'টি ব্যবহারিক প্রয়োগ উল্লেখ কর। কোনও বস্তু উত্তল লেন্স থেকে কতদূরে রাখলে তার প্রতিবিম্ব সদ হবে?

বিবর্ধক লেন্সের সাহায্যে বই পড়তে হ'লে বইয়ের পাতা থেকে লেন্সটিকে কতদূরে রাখতে হবে? এক্ষেত্রে প্রতিবিম্ব সদ্‌ না অসদ্‌ হবে?

17. 'পার্শ্বীয় পরিবর্তন' বলতে কি বোঝ? একটি লাঠিকে জলে আংশিকভাবে ডুবিয়ে রাখলে কেন সেটিকে বাঁকা দেখায়, তা চিত্র এঁকে বোঝাও। ক্যামেরার ও সমতল দর্পণের প্রতিবিম্ব সদ্‌ না অসদ্‌?

18. 'সংকট কোণ' কাকে বলে? আলোর আভ্যন্তরীণ পূর্ণ প্রতিফলনের শর্তগুলি লেখ। ভুষাকালি মাখানো ধাতব বল জলে ডোবালে চক্‌চক্‌ ক'রে কেন? 'আলোকের বিচ্ছুরণ' বলতে কি বোঝ? শুদ্ধ ও অশুদ্ধ বর্ণালী বলতে কি বোঝ? শুদ্ধ বর্ণালী গঠনের শর্তগুলি কি? 'ফোকাস দূরত্ব' কাকে বলে? আলোকের বেগ শূন্য মাধ্যমে প্রতি সেকেণ্ডে কতো মিটার?

19. একটি পরীক্ষা উল্লেখ ক'রে প্রমাণ কর যে শব্দের বিস্তারের জন্যে জড় মাধ্যমের প্রয়োজন। 0°C উষ্ণতায় শুষ্ক বায়ুতে শব্দের বেগ প্রতি সেকেণ্ডে কতো মিটার? শব্দের বেগ বায়ুতে বেশী, না জলে বেশী?

20. শব্দের প্রতিফলনের ব্যবহারিক প্রয়োগের একটি দৃষ্টান্ত চিত্র সহযোগে বর্ণনা কর। বায়ুতে শব্দের গতিবেগ বেশী, না লোহার মধ্যে বেশী? বায়ুর আর্দ্রতা বাড়লে বায়ুতে শব্দের বেগ বাড়বে, না কমবে? বায়ু বা গ্যাসে শব্দের বেগ চাপের উপর নির্ভর করে কি?

21. 'প্রতিধ্বনি' বলতে কি বোঝ? প্রতিধ্বনি তত্ত্বকে প্রয়োগ ক'রে কিভাবে সমুদ্রের গভীরতা মাপা যায়? 'শব্দ নির্বন্ধ' কাকে বলে?

22. স্বনকের কম্পাঙ্ক বলতে কি বোঝ? কম্পাঙ্কের উপর শব্দের কোন্‌ বৈশিষ্ট্য নির্ভর করে? কম্পাঙ্ক বাড়লে ঐ বৈশিষ্ট্যের কিভাবে পরিবর্তন ঘটে? কোনও বস্তুর কম্পনের ফলে শব্দের উৎপত্তি হয়—এই সত্য প্রমাণের জন্যে একটি পরীক্ষা উল্লেখ কর।

23. ওহ্‌ম এর সূত্র লেখ। ফ্লেমিং এর বামহস্ত নিয়মটি লেখ। অ্যাম্পিয়ারের সন্তরণ নিয়মটি লেখ। রোধ এবং বিভব এর সংজ্ঞা লেখ। 'ওহ্‌ম' কিসের একক? 'অ্যাম্পিয়ার' কিসের একক? 'রোধাঙ্ক' কাকে বলে? রোধাঙ্ক কিসের উপর নির্ভর করে। পরিবাহীর রোধের উপর পরিবাহীর দৈর্ঘ্য, প্রস্থচ্ছেদ, উষ্ণতা ও চাপের প্রভাব কিরূপ?

24. (ক) একটি ধাতুর দু'টি তার নেওয়া হলো। দ্বিতীয় তারটির দৈর্ঘ্য ও প্রস্থচ্ছেদ প্রথম তারটির দৈর্ঘ্য ও প্রস্থচ্ছেদের যথাক্রমে দ্বিগুণ ও অর্ধেক। দ্বিতীয় ও প্রথমটির রোধের অনুপাত কতো?

(খ) একটি তড়িৎপ্রবাহ একই সময়ের জন্যে দু'টি তারের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হয়। একটি তারের রোধ অপরটির রোধের দ্বিগুণ। প্রথম তারে উদ্ভূত তাপের পরিমাণ দ্বিতীয় তারে উদ্ভূত তাপের পরিমাণের কতো গুণ হবে?

(গ) একটি তড়িৎ পরিবাহীর রোধ অপরটির দ্বিগুণ। পরিবাহী দু'টির দুই প্রান্তের মধ্যে বিভব প্রভেদ সমান হ'লে তাদের ভেতর দিয়ে প্রবাহিত তড়িৎপ্রবাহের অনুপাত কতো হবে?

(ঘ) কোনও তারের মধ্যে দিয়ে তড়িৎ প্রবাহ দ্বিগুণ করলে একই সময়ে তড়িৎ প্রবাহ দ্বারা উদ্ভূত তাপের পরিমাণ কতোগুণ বাড়ে?

(ঙ) সমান দৈর্ঘ্যের একটি সরু ও একটি মোটা তামার তারকে একই ব্যাটারীর সঙ্গে সংযুক্ত করা হ'লে কোন্‌ তারে বেশী তড়িৎ প্রবাহিত হবে?

25. বৈদ্যুতিক মোটরের মূল নীতি বুঝিয়ে দাও। ফিউজ তার কেন ব্যবহার করা হয়? বৈদ্যুতিক মোটরের মধ্যে কোন ধরনের শক্তির রূপান্তর ঘটে? ফ্লেমিং এর

বামহস্ত নিয়ম ব্যাখ্যা করা যায় কোন্ যন্ত্রের ক্ষেত্রে? তড়িৎ চুম্বকের শক্তি কি উপায়ে বাড়ানো যায়? 'সলিনয়েড' কাকে বলে? তড়িৎচুম্বক কিভাবে তৈরি করা হয়?

26. গ্যাসের মধ্যে তড়িৎ ক্ষরণের ব্যবহারিক প্রয়োগের একটি দৃষ্টান্ত দাও। ক্যাথোড রশ্মি ও এক্স রশ্মির মধ্যে পার্থক্য কি? ক্যাথোড রশ্মির দু'টি ধর্ম উল্লেখ কর। এক্স রশ্মি কিভাবে উৎপাদন করা হয়?

(গ) বিভাগ

27. নিম্নলিখিতগুলির মধ্যে কোনগুলি ধাতু ও কোনগুলি অধাতু?

সোডিয়াম, গন্ধক, ফসফরাস, ব্রোমিন, পারদ, কার্বন ও কপার।

নিম্নলিখিতগুলির মধ্যে কোনগুলি যৌগ ও কোনগুলি মৌল?

জল, ক্লোরিন, গ্লুকোজ, ম্যাগনেসিয়াম, কলিচুন, হীরক, বোরন, বিসমাথ, অ্যামোনিয়া, নিওন।

দৈনন্দিন জীবনে আমরা ব্যবহার করি এমন পাঁচটি জৈব যৌগের নাম লেখ।

28. নিম্নলিখিতগুলির মধ্যে কোন্‌টি ভৌত ও কোন্‌টি রাসায়নিক পরিবর্তন তা কারণ সহ উল্লেখ কর ঃ

(ক) জলের তড়িৎ বিশ্লেষণ (খ) লোহার চুম্বকীকরণ (গ) চুন থেকে কলিচুন প্রস্তুতিকরণ (ঘ) জলকে বরফে পরিবর্তিত করা (ঙ) চিনিকে জলে দ্রবীভূত করা (চ) তাপের প্রভাবে কর্পূরের উবে যাওয়া।

নিম্নলিখিতগুলির মধ্যে কোন্‌টি তড়িৎযোজী এবং কোন্‌টি সমযোজী?

নাইট্রোজেন, ক্লোরিন, সোডিয়াম ক্লোরাইড, মিথেন, হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড, ক্যালসিয়াম অক্সাইড।

29. নিম্নলিখিতগুলির মধ্যে কোনটি তড়িৎ বিশ্লেষ্য এবং কোনটি তড়িৎ অবিশ্লেষ্য?

চিনি, খাদ্যলবণ, কস্টিক সোডা, গ্লিসারিন, বেনজিন।

তড়িৎ যোজ্যতা ও সমযোজ্যতা উদাহরণ সহ বুঝিয়ে দাও। একটি অম্লধর্মী ও একটি ক্ষারধর্মী গ্যাসের নাম লেখ।

কোন্ কোন্ মৌলের বহুরূপতা ধর্ম আছে? কার্বন ও ফসফরাসের রূপভেদগুলির নাম লেখ।

30. অনুঘটকের সাহায্যে প্রভাবিত হয় এমন একটি বিক্রিয়া লেখ। কেবলমাত্র সংস্পর্শে রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটে এমন একটি বিক্রিয়ার উদাহরণ দাও।

একটি দ্বি-বন্ধ এবং একটি ত্রি-বন্ধ যুক্ত হাইড্রোকার্বন যৌগের নাম ও গঠন সংকেত লেখ।

নিম্নলিখিত জৈব যৌগগুলির গঠন সংকেত লেখ। ইথাইল অ্যালকোহল, ক্লোরোফর্ম, বেনজিন, ইথেন।

একটি সংপৃক্ত ও একটি অসংপৃক্ত জৈব যৌগের নাম ও গঠন সংকেত লেখ।

31. জৈব যৌগের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি লেখ। অজৈব যৌগের সঙ্গে জৈব যৌগের প্রধান প্রধান পার্থক্যগুলি উল্লেখ কর।

রেকটিফায়েড স্পিরিট ও মেথিলেটেড স্পিরিটের মধ্যে পার্থক্য কি? ভিনিগার কি জিনিস? ভিনিগার কি কাজে লাগে?

নিম্নলিখিত যৌগগুলি প্রস্তুতির জন্যে প্রয়োজনীয় উপাদান ও ব্যবহার উল্লেখ কর ঃ

গ্লিসারিন, সাবান, বেনজিন, অ্যাসিটিলিন, ন্যাপথ্যালিন, পেট্রোল, কেরোসিন, ইউরিয়া, ব্লিচিং পাউডার, অ্যামোনিয়াম সালফেট, সোডিয়াম কার্বনেট ও গন্ধক।

32. ধাতু সংকর কাকে বলে? নিম্নলিখিত ধাতু সংকরগুলির উপাদান ও ব্যবহার উল্লেখ কর ঃ

পিতল, কাঁসা, ব্রোঞ্জ, জার্মান সিলভার।

নিম্নলিখিত ধাতুগুলির একটি ক'রে প্রাকৃতিক উৎস এবং দু'টি ক'রে ব্যবহার উল্লেখ কর ঃ

অ্যালুমিনিয়াম, লোহা, তামা ও দস্তা।

'তড়িৎ বিশ্লেষণ' বলতে কি বোঝ? তড়িৎ লেপন পদ্ধতি ব্যাখ্যা কর। 'গ্যালভানাইজেশন' বলতে কি বোঝ?

33. পরীক্ষাগারে নিম্নলিখিত যৌগগুলির প্রস্তুত প্রণালী চিত্র সহযোগে বিবৃত কর ঃ

অ্যামোনিয়া, নাইট্রোজেন, হাইড্রোজেন সালফাইড ও হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড।

সংস্পর্শ পদ্ধতিতে H_2SO_4 উৎপাদনের মূলনীতি ব্যাখ্যা কর। হাইড্রোজেন ক্লোরাইড ও হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের মধ্যে পার্থক্য কি? 2Cl এবং Cl_2 এর মধ্যে পার্থক্য কি? ক্ষার ও ক্ষারকের মধ্যে পার্থক্য কি? 'জায়মান হাইড্রোজেন' বলতে কি বোঝ? 'অনুঘটক' বলতে কি বুঝ? গ্যাসের 'অন্তর্ধৃতি' বলতে কি বোঝ?

34. (ক) প্রমাণ কর যে হীরক কার্বনের একটি রূপভেদ।

(খ) কোন্ রাসায়নিক বিক্রিয়ার সাহায্যে H_2S গ্যাসকে ও Cl_2 গ্যাসকে সনাক্ত করা যায়?

(গ) কোন্ রাসায়নিক বিক্রিয়ার সাহায্যে HNO_3 কে সনাক্ত করা যায়?

(ঘ) সংপৃক্ত ও অসংপৃক্ত দ্রবণ বলতে কি বোঝ? খাদ্য লবণের অসংপৃক্ত দ্রবণে আরও খাদ্য লবণ না মিশিয়ে কি ভাবে ঐ দ্রবণকে সংপৃক্ত করা যায়?

(ঙ) কি ভাবে অ্যামোনিয়া গ্যাসকে শুষ্ক করা হয়?

(চ) কার্বন ডাই অক্সাইডকে কিভাবে সনাক্ত করা যায়?

(ছ) একটি পরীক্ষা উল্লেখ করে প্রমাণ কর যে গাঢ় $H_2SO_4^-$ এর জলের প্রতি আসক্তি অতি প্রবল।

(জ) $N_2 + 3H_2 = 2NH_3$ সমীকরণটির তাৎপর্যগুলি লিখ।

35. সংজ্ঞা উল্লেখ ক'রে নিম্নলিখিতগুলির উদাহরণ দাও। (ক) অ্যাসিড (খ) ক্ষারক (গ) লবণ (ঘ) প্রশমন একটি মাত্র নীল লিটমাস কাগজের সাহায্যে কি ভাবে (i) কস্টিক সোডার দ্রবণ (ii) লঘু H_2SO_4 এবং (iii) সোডিয়াম ক্লোরাইড দ্রবণকে সনাক্ত করা যায়?

36. মেণ্ডেলিফের পর্যায় সূত্রটি লেখ। আধুনিক পর্যায় সূত্রটি লেখ। আধুনিক পর্যায় সারণীতে কয়টি শ্রেণী ও কয়টি পর্যায় আছে? পর্যায় সারণী ও শ্রেণী কাদের বলে? পর্যায় সারণীর উপযোগিতা উল্লেখ কর।

নিম্নলিখিত মৌলগুলি পর্যায় সারণীর কোন্ শ্রেণীতে ও কোন্ পর্যায়ে আছে?

হাইড্রোজেন, হিলিয়াম, ক্লোরিন, আয়রন, অক্সিজেন, অ্যালুমিনিয়াম, কার্বন, আয়োডিন।

37. কিরূপ বিক্রিয়া ঘটে, সমীকরণ সহ লেখ।

(ক) সিলভার নাইট্রেট দ্রবণের উপর HCl ঢালা হইল।

(খ) শীতল ও লঘু HNO_3 তামার উপর ঢালা হইল।

(গ) উত্তপ্ত কস্টিক সোডার সহিত দস্তার বিক্রিয়া ঘটানো হইল।

(ঘ) লোহিত-তপ্ত লোহার উপর দিয়া স্টীম পরিচালনা করা হইল।

উত্তপ্ত কস্টিক সোডা দ্রবণের সহিত অ্যালুমিনিয়ামের বিক্রিয়া ঘটানো হইল।

(চ) বায়ুতে Mg ধাতুকে দহন করা হইল।

(ছ) $BaCl_2$ দ্রবণের সহিত লঘু H_2SO_4 মিশ্রিত করা হইল।

(জ) অ্যামোনিয়াম হাইড্রক্সাইডের সহিত H_2SO_4 এর বিক্রিয়া ঘটানো হইল।

(ঝ) স্বচ্ছ চুন-জলে CO_2 গ্যাস পরিচালনা করা হইল।

(ঞ) অ্যামোনিয়া গ্যাসকে জলে দ্রবীভূত করা হইল।

38. নিম্নলিখিত বিক্রিয়াগুলির প্রত্যেকটিতে কোনটি জারক ও কোন্‌টি বিজারক দ্রব্য রূপে কাজ করে তা যুক্তি সহ লেখ।

(i) $MnO_2 + 4HCl = MnCl_2 + Cl_2 + 2H_2O$

(ii) $C + 2H_2SO_4 = CO_2 + 2SO_2 + 2H_2O$

(iii) $H_2S + H_2SO_4 = S + SO_2 + 2H_2O$

(iv) $C + 4HNO_3 = CO_2 + 4NO_2 + 2H_2O$

(v) $3CuO + 2NH_3 = 3Cu + 3H_2O + N_2$

(vi) $Cl_2 + H_2S = 2HCl + S$

39. (i) 5 গ্রাম $KClO_3$কে উত্তপ্ত করলে কতো ওজনের অক্সিজেন পাওয়া যাবে?

(ii) 11 গ্রাম CO_2 গ্যাস পেতে হলে কতো ওজনের $CaCO_3$কে উত্তপ্ত করতে হবে?

(iii) H_2SO_4 এর আণবিক গুরুত্ব কতো, গণনা করে দেখাও।

(iv) 1 গ্রাম-অণু ক্লোরিনে অণুর সংখ্যা কতো?

(v) প্রমাণ চাপ ও উষ্ণতায় 2 গ্রাম H_2 এবং 16 গ্রাম O_2 এর মধ্যে কোন্‌টিতে অণুর সংখ্যা বেশী?

(vi) 32 গ্রাম SO_2 গ্যাস পেতে হলে কতো গ্রাম তামার সঙ্গে গাঢ় H_2SO_4 এর বিক্রিয়া ঘটাতে হবে? [$Cu = 63.5$; $S = 32$; $O = 16$]

(vii) $CaCl_2$ যৌগে Ca এর শতকরা পরিমাণ কতো? [$Ca = 40$; $Cl = 35.5$]

(viii) অতিরিক্ত লঘু H_2SO_4 এর সঙ্গে ফেরাস সালফাইডের বিক্রিয়া ঘটিয়ে প্রমাণ চাপ ও উষ্ণতায় 1.12 লিটার গ্যাস পেতে হলে কতো পরিমাণ ফেরাস সালফাইড প্রয়োজন?

40. নীচের সমীকরণগুলিকে ব্যালেন্স (সুসমঞ্জস) কর ঃ—

(i) $KCO_3 \rightarrow KCl + O_2$

(ii) $Cu + O_2 \rightarrow CuO$

(iii) $Al + HCl \rightarrow AlCl_3 + H_2$

(iv) $Al + H_2O \rightarrow Al(OH)_3 + H_2$

(v) $NH_3 + O_2 \rightarrow N_2 + H_2O$

(vi) $Cu + H_2SO_4 \rightarrow CuSO_4 + SO_2 + H_2$

(vii) $MnO_2 + HCl \rightarrow MnCl_2 + H_2O + Cl_2$

(viii) $Fe + H_2O \rightarrow Fe_3O_4 + H_2$

খড়্গপুর রেলওয়ে বয়েজ স্কুল, পোঃ-খড়্গপুর, মেদিনীপুর।

সম্ভাব্য প্রশ্ন ও উত্তরঃ মাধ্যমিক পরীক্ষা ১৯৮২

পদার্থবিদ্যা

ডঃ অলক চক্রবর্তী

মাধ্যমিক পরীক্ষা প্রায় এসে গেল। পড়াশুনো নিশ্চয়ই তোমরা মোটামুটি করেছ। মৌখিক প্রশ্নের উত্তর হয়তো সবই তোমরা দিতে পারবে। কিন্তু লিখিতভাবে প্রশ্নের উত্তর দিতে গেলে তোমাদের কিছু কিছু ভুল ভ্রান্তি হতে পারে। তাই পদার্থবিদ্যার প্রশ্নের উত্তর লেখার ধরন বা পদ্ধতি সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করছি।

প্রথমে যে কথাগুলো বলছি সেগুলি শুধু পদার্থবিদ্যার জন্যই নয়, যে কোন বিষয়ের ক্ষেত্রেই সমানভাবে প্রযোজ্য। এগুলি হলঃ

1. উত্তরপত্র পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন হওয়া দরকার।

2. হাতের লেখা সুন্দর হওয়া বাঞ্ছনীয়।

3. বানান ভুল যাতে না হয় সেদিকে দৃষ্টি দেওয়া দরকার।

4. খাতার বাঁদিকে এবং উপরে পর্যাপ্ত জায়গা ছাড়া উচিত।

5. প্রশ্ন পত্রে কোন্ বিভাগ থেকে কটি প্রশ্নের উত্তর করতে হবে *সেগুলি ভাল করে দেখতে হবে।*

6. যে কোন প্রশ্নে সাধারণত অনেকগুলি ভাগ থাকে। সবগুলির উত্তর একই সঙ্গে দেওয়া ভাল।

7. কোন প্রশ্ন উত্তর করার আগে প্রশ্নটি ভালভাবে দু'তিনবার পড়ে, প্রশ্নের বিভিন্ন অংশের উত্তর ভেবে নেওয়া উচিত।

8. কোন প্রশ্নের বিভিন্ন অংশের উত্তর আলাদা আলাদা অনুচ্ছেদে লিখতে হবে। কারণ বিভিন্ন অংশের জন্য আলাদা ভাবে নম্বর নির্ধারিত থাকে। বিভিন্ন অনুচ্ছেদ ভেঙে লিখলে পরীক্ষকের পক্ষে পরীক্ষা করা সুবিধা হয়।

এবার পদার্থবিদ্যার প্রসঙ্গে কিছু আলোচনা করা যাক। মাধ্যমিক পরীক্ষায় পদার্থবিদ্যায় প্রশ্নের উত্তর লেখার সময় যে সব ভুল দেখা যায় সেগুলি একে একে বলছি, তোমরা নিশ্চয়ই এ ভুলগুলি করবে না।

1. গলনাঙ্ক, স্ফুটনাঙ্ক ইত্যাদির সংজ্ঞা লেখার সময়ে **'স্বাভাবিক চাপে'** কথাটার উল্লেখ থাকে না।

2. অনেক প্রশ্নের উত্তর চিত্রসহ করা উচিত। বিশেষ করে আলোক বিজ্ঞানের প্রশ্নে। অধিকাংশ ছাত্রই চিত্রসহ উত্তর লেখে না।

3. চিত্র সবসময়েই পেন্সিলে আঁকা উচিত। প্রয়োজনমত স্কেল ব্যবহার করা উচিত। চিত্রের বিভিন্ন অংশ চিহ্নিত করা দরকার। লক্ষ্য রাখতে হবে চিত্রটি যেন উত্তরের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়। অনেকেই কালি দিয়ে চিত্র আঁকে বা বিভিন্ন অংশ যথাযথ চিহ্নিত করে না।

4. আলোক বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বিভিন্ন চিত্রে আলোক-রশ্মির দিক তীর চিহ্ন দিয়ে নির্দেশ করা দরকার। দিক চিহ্ন না থাকলে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিতে সমস্ত চিত্রটি অর্থহীন হয়ে যায়।

5. তড়িৎ বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও প্রবাহমাত্রার অভিমুখ দেখানো থাকে না। এটা দেখানো দরকার।

6. যে কোন সংজ্ঞার উত্তর লেখার সময়ে সেটির একক উল্লেখ করা উচিত। অনেকেই এককের সম্বন্ধে আলোচনা করে না।

7. আবার একক লিখতে গিয়ে ভুল করলেও চলবে না। আলোকের বা শব্দের বেগের মান লিখতে গিয়ে অনেকেই **'প্রতি সেকেণ্ড'** কথাটি লেখে না। ফলে সম্পূর্ণ জিনিসটি অর্থহীন হয়ে যায়।

8. পদার্থবিদ্যার অঙ্ক করার সময়ে ব্যবহৃত সূত্রের (formula) প্রতিটি রাশির পরিচয় দেওয়া দরকার। ধরা যাক $v = u + ft$, এই সমীকরণটি কোন অঙ্ক করার জন্য ব্যবহার করা হয়। এখানে v, u, f এবং t বলতে কি বোঝাচ্ছে সেগুলি লেখা দরকার।

9. বয়েল এবং চার্লসের সূত্র লিখতে গিয়ে অনেক সময়ে **নির্দিষ্ট ভর** কথাটার উল্লেখ থাকে না। নির্দিষ্ট ভর না বললে সম্পূর্ণ সূত্রটাই ভুল হয়ে গেল।

10. ছোট ছোট প্রশ্নের উত্তর সম্পূর্ণ বাক্যের সাহায্যে দেওয়া দরকার। ধর, তোমায় প্রশ্ন করা হল, 'দৌড় প্রতিযোগিতার সময়ে মাপার জন্য কোন ঘড়ি ব্যবহার করা হয়। এর উত্তরে শুধু 'স্টপ ঘড়ি.' লিখলে চলবে না। লিখতে হবে, দৌড় প্রতিযোগিতার সময়ে মাপার জন্য স্টপঘড়ি ব্যবহার করা হয়।'

11. বৈজ্ঞানিক কারণ লেখার সময়ে কারণটি যথাযথ হচ্ছে কিনা সেটি ভাল করে বিবেচনা করতে হবে। একটা উদাহরণ নেওয়া যাক। ধর, তোমায় প্রশ্ন করা হয়েছে, "গরম চা কাপ থেকে ডিসে ঢাললে তাড়াতাড়ি ঠাণ্ডা হয় কেন ?"

সাধারণত বেশীর ভাগ ছাত্র-ছাত্রীদের কাছ থেকে যে উত্তর পাওয়া যায় সেটি হল, "কাপ থেকে ডিসে চা ঢাললে চা-এর উপরিতলের ক্ষেত্রফল বেড়ে যায়। ফলে বাষ্পায়নের হার বেড়ে যায়। তাই চা তাড়াতাড়ি ঠাণ্ডা হয়। কিন্তু এটা কি সঠিক উত্তর হল ?

বাষ্পায়নের সঙ্গে ঠাণ্ডা হওয়ার সম্পর্কটা তো জানা গেল না। তাই যদি আরও লেখা হত, ডিসে চা ঢাললে বাষ্পায়নের হার বৃদ্ধি পায় এবং বাষ্পায়নের জন্য যে লীন তাপ দরকার সেটি ঐ ডিসের চা থেকেই আসে। তাই চা দ্রুত তাপ হারিয়ে ঠাণ্ডা হয়।

12. অঙ্কের প্রশ্নের উত্তর করলে, প্রয়োজনীয় গুণ ভাগ পরিষ্কার করে দেখানো দরকার। যথাযথ স্থানে একক উল্লেখ করা উচিত, এবং উত্তরটি আলাদা করে এককসহ লেখা দরকার।

উপরে লেখা নির্দেশগুলি মন দিয়ে বেশ কয়েকবার পড়, তাহলেই পদার্থবিদ্যার প্রশ্নের উত্তর সঠিকভাবে সহজেই দিতে পারবে।

তোমাদের সুবিধার জন্য কয়েকটি বিশেষ প্রশ্নোত্তর এই সঙ্গে দেওয়া হল। এগুলি ভাল করে বারে বারে পড়বে।

পদার্থবিদ্যার কয়েকটি বিশেষ প্রশ্নোত্তর

1. সেন্টিগ্রেড স্কেলে পরম উষ্ণতার মান কত ? ফারেনহাইট স্কেলে পরম উষ্ণতার মান বার কর।

সেন্টিগ্রেড স্কেলের পরম উষ্ণতার মান – 273°C।
ফারেনহাইট স্কেলে পরম উষ্ণতার মান F হলে

$\frac{C}{5}=\frac{F-32}{9}$ সূত্র থেকে পাই $\frac{-273}{5}=\frac{F-32}{9}$

বা, $5F-160=-2457$

বা, $5F=-2457+160=-2297$

বা, $F=\frac{-2297}{5}=-459{\cdot}4°F$

∴ ফারেনহাইট স্কেলে পরম উষ্ণতার মান—459·4°F।

2. বায়ুতে শব্দের বেগ বেশী না আলোর বেগ বেশী ? বজ্রপাতের আলো দেখার কিছুক্ষণ পর আমরা এর শব্দ শুনতে পাই কেন ?

আমরা জানি বায়ুতে শব্দের বেগ 1120 ফুট/সেকেণ্ড এবং বায়ুতে আলোর বেগ 1,86,000 মাইল/সেকেণ্ড, সুতরাং বায়ুতে আলোর বেগ অনেক বেশী।

বজ্রপাতের সময় আলো এবং শব্দ একই সঙ্গে উৎপন্ন হয়, কিন্তু এদের উৎপত্তিস্থল আমাদের কাছ থেকে বেশ খানিকটা দূরে হয়। কিন্তু আমরা জানি বায়ুতে আলোর বেগ শব্দের বেগের তুলনায় অনেক বেশী, তাই বজ্রের উৎপত্তিস্থল থেকে আলো যে সময়ে আমাদের কাছে এসে পৌঁছায়, শব্দের আসতে তার চাইতে বেশী সময় লাগে। তাই বজ্রপাতের আলো দেখার কিছুক্ষণ পর আমরা এর শব্দ শুনতে পাই।

3. দূরের ঘণ্টার শব্দ শুনে ঘড়ি মেলালে ঘড়ি কি সঠিক সময় দেখাবে ? কারণসহ উত্তর লেখ।

দূরের ঘণ্টার শব্দ শুনে ঘড়ি মেলালে পরে দেখা যাবে ঘড়ি স্লো যাচ্ছে অর্থাৎ ঘড়ি সঠিক সময় দেখাবে না।

বায়ু মাধ্যমে শব্দ নির্দিষ্ট বেগে চলে। দূরে অবস্থিত ঘণ্টা থেকে নির্গত শব্দ বায়ু মাধ্যমের ভিতর দিয়ে আসে বলে শব্দ সৃষ্টি হওয়ার কিছু সময় পর শ্রোতার কাছে পৌঁছায়। ফলে ঐ শব্দ শুনে ঘড়ি মেলালে যে সময় ঘণ্টার শব্দ নির্গত হয়েছে ঘড়ি তার কিছুক্ষণ পর সেই সময় নির্দেশ করে, অর্থাৎ ঘড়ি স্লো দেখায়।

4. দীর্ঘ এবং ফাঁপা লোহা পাইপের এক প্রান্তে শব্দ করলে অন্য প্রান্তে দুটি পৃথক শব্দ শোনা যায় কেন ?

বিভিন্ন মাধ্যমে শব্দের বেগ বিভিন্ন। 0°C উষ্ণতায় বায়ুতে শব্দের বেগ 332 মিঃ সেকেণ্ড আর লোহাতে শব্দের বেগ 5130 মিঃ/সেকেণ্ড। দীর্ঘ ও ফাঁপা লোহার পাইপের এক প্রান্তে শব্দ সৃষ্টি করলে শব্দ লোহার মধ্য দিয়ে এবং বায়ুর মধ্য দিয়ে অন্য প্রান্তে পৌঁছায়। লোহার ভিতর দিয়ে যে শব্দ যায় তার বেগ অনেক বেশী বলে সেটি অপর প্রান্তে আগে পৌঁছায় এবং তার তীব্রতাও বেশী হয়। আর বায়ুর ভিতর দিয়ে শব্দের বেগ কম বলে বায়ুর ভিতর দিয়ে শব্দ অপর প্রান্তে পরে গিয়ে পৌঁছায় এবং এই শব্দের তীব্রতাও কম হয়। তাই পাইপের অন্য প্রান্ত থেকে প্রথমে একটি জোড়ালো শব্দ এবং পরে এক ক্ষীণ শব্দ শোনা যায়।

5. সূর্যে প্রচণ্ড শব্দ হলে পৃথিবী থেকে কি তা শোনা যাবে ? তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও।

সূর্যে প্রচণ্ড শব্দ হলে পৃথিবী থেকে তা শোনা যাবে না। কারণ আমরা জানি শব্দ বিস্তারের জন্য বাস্তব মাধ্যমের দরকার। কিন্তু পৃথিবী থেকে সূর্যের দূরত্ব প্রায় 93,000,000 মাইল এবং এর অধিকাংশ স্থানই ফাঁকা অর্থাৎ অধিকাংশ স্থানেই বাস্তব মাধ্যম নেই। বাস্তব মাধ্যমের অভাবে শব্দের বিস্তার সম্ভব নয় বলেই সূর্যে প্রচণ্ড শব্দ হলেও পৃথিবী থেকে তা শোনা যায় না।

6. আলো ও শব্দের প্রতিফলনের জন্য কি ধরনের প্রতিফলক প্রয়োজন ?

আলো তরঙ্গের আকারে অগ্রসর হয়। কিন্তু আলোকের তরঙ্গ দৈর্ঘ্য খুব কম বলে আলোর প্রতিফলক তল খুব মসৃণ হওয়া প্রয়োজন। এ ছাড়া প্রতিফলক তল খুব ছোট হলেও আলোর প্রতিফলন হওয়া সম্ভব।

শব্দও আলোকের মত তরঙ্গের আকারে অগ্রসর হয়। কিন্তু শব্দের তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য আলোকের তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য অপেক্ষা অনেক বড় বলে প্রতিফলক তলের আকার বেশ বড় হওয়া প্রয়োজন। ঘরের দেওয়াল, পাহাড়, গাছের সারি প্রভৃতি শব্দের প্রতিফলকের কাজ করে। শব্দের প্রতিফলনের ক্ষেত্রে প্রতিফলক তল মসৃণ না হলেও চলে।

7. সমান দৈর্ঘ্যের দুটি তামার তারের একটির দৈর্ঘ্য অপরটির দৈর্ঘ্যের দ্বিগুণ, এদের একই বিভব প্রভেদে যুক্ত করলে কোন্ তারে অধিক তড়িৎপ্রবাহ হবে ?

পরিবাহী তারের দুই প্রান্তের বিভব প্রভেদ অপরিবর্তিত থাকলে প্রবাহমাত্রা রোধের ব্যস্তানুপাতিক হয়। অর্থাৎ যে তারের রোধ বেশী তাতে তড়িৎপ্রবাহ কম হবে। আবার পরিবাহীর রোধ এর দৈর্ঘ্যের সমানুপাতিক। অর্থাৎ দৈর্ঘ্য বাড়লে রোধ বাড়বে। সুতরাং যে তারটির দৈর্ঘ্য দ্বিগুণ তার রোধও ছোট তারের দ্বিগুণ। অতএব লম্বা তারের রোধের অর্ধেক হওয়ায় ছোট তারের প্রবাহমাত্রা লম্বা তারের দ্বিগুণ হবে। অর্থাৎ ছোট তারের প্রবাহমাত্রা অধিক হবে।

8. কোন্ ধাতব তারের মধ্য দিয়ে ইলেকট্রনগুলি পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে গেলে তড়িৎপ্রবাহ কোন্ দিকে হবে ?

কোন ধাতব তারের মধ্য দিয়ে ইলেকট্রনগুলি পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে গেলে তড়িৎপ্রবাহ হবে পূর্ব থেকে পশ্চিম দিকে। কারণ আমরা জানি তড়িৎপ্রবাহের অভিমুখ ইলেকট্রনের প্রবাহের বিপরীত দিকে।

9. সমান দৈর্ঘ্যের দুটি তামার তারের একটির প্রস্থচ্ছেদ-ক্ষেত্রফল অপরটির দ্বিগুণ, এদের একই বিভব প্রভেদে যুক্ত করলে কোন্ তারে অধিক তড়িৎপ্রবাহ হবে ?

পরিবাহী তারের বিভব প্রভেদ অপরিবর্তিত থাকলে প্রবাহ মাত্রা রোধের ব্যস্তানুপাতিক হয়। অর্থাৎ যে তারের রোধ বেশী হবে তাতে তড়িৎ প্রবাহ কম হবে। আবার পরিবাহীর রোধ এর প্রস্থচ্ছেদের ব্যস্তানুপাতিক। সুতরাং যে তারটি দ্বিগুণ মোটা তার রোধ সরু তারের রোধের অর্ধেক হবে। অতএব মোটা তারের রোধ কম হওয়ায় এর প্রবাহমাত্রা বেশী হবে। এবং মোটা তারের রোধ অর্ধেক হওয়ায় এর প্রবাহমাত্রা সরু তারের প্রবাহমাত্রার দ্বিগুণ হবে।

10. সমান রোধের দুটি তামার তারের মধ্য দিয়ে একই সময়ের জন্য প্রথমটিতে যে প্রবাহমাত্রা পাঠানো হল দ্বিতীয়টিতে তার দ্বিগুণ প্রবাহমাত্রা পাঠানো হয়। উভয় তারে উৎপন্ন তাপের অনুপাত বার কর।

মনে করি, প্রথম তারে উৎপন্ন তাপ H_1 এবং প্রবাহমাত্রা C_1

এবং দ্বিতীয় তারে উৎপন্ন তাপ H_2 এবং প্রবাহমাত্রা C_2

জুলের প্রবাহমাত্রার সূত্র থেকে পাওয়া যায় পরিবাহীর রোধ ও সময় অপরিবর্তিত থাকলে উৎপন্ন তাপ (H) প্রবাহমাত্রার (C) বর্গের সমানুপাতিক। অর্থাৎ $H \propto C^2$;

$$\therefore \text{ পাওয়া যায়, } \frac{H_1}{H_2} = \frac{C_1^2}{C_2^2}$$

এখানে $C_2 = 2C_1$

$$\therefore \frac{H_1}{H_2} = \frac{C_1^2}{(2C_1)^2} = \frac{C_1^2}{4C_1^2} = \frac{1}{4}$$

$$\therefore H_1 : H_2 = 1 : 4$$

দুটি তারে উৎপন্ন তাপের অনুপাত 1 : 4।

11. দুটি সমান দৈর্ঘ্যের একটি সরু ও একটি মোটা তামার তারের মধ্য দিয়ে সমান তড়িৎপ্রবাহ একই সময়ের জন্য পাঠালে কোন্ তারে বেশী তাপ উৎপন্ন হবে ?

জুলের সূত্র থেকে পাওয়া যায়, পরিবাহীতে উৎপন্ন তাপ রোধের সমানুপাতিক, যদি সময় ও প্রবাহমাত্রা অপরিবর্তিত থাকে। আবার মোটা তারের রোধ সরু তারের রোধ অপেক্ষা অনেক কম হওয়ায় সরু তারে উৎপন্ন তাপ মোটা তারে উৎপন্ন তাপ অপেক্ষা বেশী হবে।

12. একই তড়িৎপ্রবাহ একই সময়ের জন্য দুটি তামার তারের মধ্য দিয়ে পাঠানো হল। একটি তারের রোধ অপরটির দ্বিগুণ। যে তারের রোধ বেশী তাতে উৎপন্ন তাপ অন্য তারের কতগুণ ?

জুলের সূত্র থেকে পাওয়া যায় প্রবাহমাত্রা ও সময় অপরিবর্তিত থাকলে উৎপন্ন তাপ রোধের সমানুপাতিক, অর্থাৎ কোন পরিবাহীর রোধ যতগুণ বেশী হবে উৎপন্ন তাপও ততগুণ বেশী হবে। এখানে প্রথম তারের রোধ দ্বিতীয় তারের দ্বিগুণ হওয়ায় প্রথম তারে উৎপন্ন তাপ দ্বিতীয় তারে উৎপন্ন তাপের দ্বিগুণ হবে।

13. একটি তামার তারের মধ্য দিয়ে পূর্ব থেকে পশ্চিম দিকে এবং সমান রোধের আর একটি তামার তারের মধ্য দিয়ে পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে একই তড়িৎপ্রবাহ পাঠানো হল। একই সময়ে দুটি তারে উদ্ভূত তাপের পরিমাণ কি হবে ? যুক্তি দাও।

দুটি তারে উদ্ভূত তাপের পরিমাণ সমান হবে। আমরা জানি পরিবাহীতে উৎপন্ন তাপ পরিবাহীর রোধ, প্রবাহমাত্রা ও সময়ের উপর নির্ভর করে। কিন্তু তড়িৎ-প্রবাহের অভিমুখের উপর নির্ভর করে না। এখানে দুটি তারের রোধ, প্রবাহমাত্রা ও তড়িৎপ্রবাহের সময় একই থাকায়, কিন্তু তড়িৎ-প্রবাহের অভিমুখ আলাদা থাকায় উৎপন্ন তাপের পরিমাণ একই হবে।

14. তড়িৎ চুম্বকের মেরুশক্তি কিভাবে বৃদ্ধি করা যায় ?

তড়িৎ চুম্বকের মেরু শক্তি দু'ভাবে বৃদ্ধি করা যায়। (i) চৌম্বক পদার্থের উপর জড়ানো অন্তরিত তারের পাক সংখ্যা বৃদ্ধি করে তড়িৎ চুম্বকের মেরু শক্তি বৃদ্ধি করা যায়।

(ii) চৌম্বক পদার্থের উপর জড়ানো অন্তরিত তারের মধ্য দিয়ে পাঠানো তড়িৎপ্রবাহ মাত্রা বাড়িয়েও তড়িৎ চুম্বকের মেরু শক্তি বৃদ্ধি করা যায়।

15. সলিনয়েড কাকে বলে ? তড়িৎবাহী সলিনয়েড চুম্বকের মত ব্যবহার করে কেন ?

স্প্রিং-এর আকারে পাকানো ও ঘন সন্নিবিষ্ট একটি অন্তরিত পরিবাহী তারকে সলিনয়েড বলে। অনেক সময় কোন অন্তরক চোঙের গায়ে অন্তরিত পরিবাহী তার জড়িয়েও সলিনয়েড তৈরি করা হয়।

সলিনয়েডের মধ্য দিয়ে তড়িৎ প্রবাহ পাঠালে এক একটি পাকানো তারের জন্য চৌম্বক ক্ষেত্রের সৃষ্টি হয় এবং অনেকগুলি তার দিয়ে সলিনয়েড তৈরী বলে এর চার পাশে মোট চৌম্বক ক্ষেত্র অত্যন্ত প্রবল হয়। এর ফলে সলিনয়েডের দুই প্রান্তে দুটি চুম্বক মেরুর সৃষ্টি হয় এবং সলিনয়েড একটি দণ্ড চুম্বকের মত ব্যবহার করে।

16. দৈর্ঘ্য বা ভরের এককের সংজ্ঞায় উষ্ণতার উল্লেখ করা হয় কেন ?

দৈর্ঘ্যের একক নির্ধারণে ধাতব দণ্ডের ব্যবহার করা হয়। কিন্তু ধাতব দণ্ডের দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি বা হ্রাস করলে উষ্ণতা যথাক্রমে হ্রাস বা বৃদ্ধি পায়। ফলে প্রমাণ মিটার বা প্রমাণ গজের দণ্ড বিভিন্ন উষ্ণতায় থাকলে পরিমাপ ত্রুটিপূর্ণ হয়। পরিমাপ নির্ভুল করার জন্য প্রমাণ মিটার বা প্রমাণ গজের দণ্ড নির্দিষ্ট উষ্ণতায় রাখা হয় এবং সংজ্ঞায় ঐ উষ্ণতা উল্লেখ করা হয়। সি. জি. এস পদ্ধতিতে 4°C উষ্ণতায় এক ঘন সেণ্টিমিটার বিশুদ্ধ জলের ভরকে এক গ্রাম বলা হয়। এটি সি. জি. এস পদ্ধতিতে ভরের একক। উষ্ণতা পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে জলের ঘনত্বের পরিবর্তন হয়। তাই বিভিন্ন উষ্ণতায় এক ঘন সেণ্টিমিটার বিশুদ্ধ জলের ভর সমান হয় না। ফলে এককে ত্রুটি দেখা যায়। একক ত্রুটিমুক্ত করার জন্য জলের উষ্ণতা 4°C-এ স্থির রাখা প্রয়োজন। এই কারণেই ভরের এককের সংজ্ঞাতে ঐ নির্দিষ্ট উষ্ণতা উল্লেখ করা হয়।

17. সাধারণ স্কেলের সাহায্যে বই-এর একটি পাতার বেধ কিভাবে মাপা যায় ?

বই-এর একটি পাতার বেধ অত্যন্ত কম। কিন্তু সাধারণ স্কেলের সাহায্যে সরাসরি অত সূক্ষ্ম পরিমাপ করা সম্ভব নয়। তাই সাধারণ স্কেলের সাহায্যে একটি পাতার বেধ সরাসরি না মেপে অন্য পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়। প্রথমে বইটির সবগুলির পাতার বেধ এক সঙ্গে সাধারণ স্কেল দিয়ে মাপা হয়। এভাবে বই-এর সবগুলি পাতার বেধ বিভিন্ন জায়গায় মেপে তাদের গড় নিলে সবগুলি পাতার সঠিক বেধ পাওয়া যায়। ঐ গড় বেধকে বই-এর পাতার সংখ্যা দিয়ে ভাগ করলেই একটি পাতার বেধ পাওয়া যাবে।

18. ত্বরণের এককে 'প্রতি সেকেণ্ড' কথাটি দুবার আসে কেন ?

সরণের হারকে বেগ বলে। সুতরাং বেগের এককে 'প্রতি সেকেণ্ডে' কথাটি একবার আসে। আবার বেগ পরিবর্তনের হারকে ত্বরণ বলে। তাই বেগের পরিবর্তন বোঝানোর জন্য একবার 'প্রতি সেকেণ্ডে' কথাটি আসে। সুতরাং ত্বরণের এককে একবার বেগ বোঝানোর জন্য এবং একবার বেগ পরিবর্তনের হার বোঝানোর জন্য প্রতি সেকেণ্ডে কথাটি দুবার আসে।

19. মোমবাতিকে বাতাসে পোড়ালে এর ওজন হ্রাস পায়। বাকী ভরের কি হয় ? এখানে কি ভরের সংরক্ষণ সূত্র রক্ষিত হয় ?

মোম প্রধানত কার্বন ও হাইড্রোজেন ঘটিত কয়েকটি জৈব যৌগ নিয়ে গঠিত। বায়ুতে দহনের সময়ে ঐ সব যৌগগুলির কার্বন ও হাইড্রোজেন বায়ুর অক্সিজেনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যথাক্রমে কার্বন ডাই অক্সাইড ও জলীয় বাষ্প উৎপন্ন করে। কার্বন ডাই অক্সাইড ও জলীয় বাষ্প উভয়েই গ্যাসীয় পদার্থ বলে বায়ুতে মিশে যায়। মোম পোড়ার পর অবশেষরূপে সামান্য মোম এবং পলতের দগ্ধাবশেষ পড়ে থাকে। তাই দহনে মোমের প্রধান উপাদান কার্বন ও হাইড্রোজেন যৌগ সৃষ্টি করে বাতাসে মেশে বলেই মোমের ওজন হ্রাস পায়।

যদিও এখানে আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় মোমবাতির ক্ষয় হওয়ায় ভরের সংরক্ষণ সূত্র রক্ষিত হয়নি। কিন্তু প্রকৃত

পক্ষে তা হয় না। এখানেও ভরের সংরক্ষণ সূত্র রক্ষিত হয়। কারণ অবদ্ধ পাত্রে মোমবাতি নিয়ে পোড়ালে দেখা যায় দহনের পূর্বে পাত্রের মোট ওজন (মোমবাতি ও পাত্র মধ্যস্থ বায়ুসহ) দহনের পর পাত্রের ওজন (অবশিষ্ট মোম ও পাত্রস্থ গ্যাসীয় পদার্থসহ) পরস্পর সমান। অর্থাৎ দহনের ফলে ভরের সংরক্ষণ সূত্র লঙ্ঘিত হয়নি।

20. **শীতের দেশে ঠান্ডা জলের পাইপের চেয়ে গরম জলের পাইপ বেশী ফাটে কেন ?**

শীতের দেশে বায়ুমণ্ডলের উষ্ণতা অনেক সময় 0°C-এর অনেক নীচে নেমে যায়। ঠাণ্ডা বায়ুমণ্ডলের সংস্পর্শে অনেক সময় শীতের দেশের পাইপের জল জমে বরফে পরিণত হয়। কিন্তু আমরা জানি জল জমে বরফে পরিণত হলে এর আয়তন বৃদ্ধি হয়। আয়তন বৃদ্ধির ফলে যে চাপের সৃষ্টি হয় তাতে অনেক সময়ে জলের পাইপ ফেটে যায়। দেখা যায় ঠাণ্ডা জলের পাইপ অপেক্ষা গরম জলের পাইপ বেশী ফাটে। ঠাণ্ডা জলে দ্রবীভূত বায়ু থাকে। ঐ জল যখন জমে বরফে পরিণত হয় তখন দ্রবীভূত বায়ু অপসারিত হয়। এবং জল জমে বরফে পরিণত হওয়ার ফলে যে আয়তন প্রসারণ হয় তা বায়ুর স্থান দখল করতে পারে না বলেই পাইপের ওপর প্রচণ্ড চাপ পড়ে। ফলে পাইপ ফাটে। এই কারণেই শীতের দেশে ঠাণ্ডা জলের পাইপের চেয়ে গরম জলের পাইপ বেশী ফাটে।

21. **100°C উষ্ণতার জলের চেয়ে 100°C উষ্ণতার স্টীম দেহে বেশী ক্ষত সৃষ্টি করে কেন ?**

আমাদের দেহ কোন উষ্ণ বস্তুর সংস্পর্শে এসে উষ্ণ বস্তু থেকে দ্রুত তাপ গ্রহণ করে ফলে দেহের ক্ষতের সৃষ্টি হয়। প্রতি গ্রাম 100°C উষ্ণতার গরম জল অপেক্ষা প্রতি গ্রাম 100°C উষ্ণতার স্টীমে 540 ক্যালোরি তাপ বেশী থাকে। কারণ জলের বাষ্পীভবনের লীন তাপ 540 ক্যালরি প্রতি গ্রামে। তাই আমাদের দেহ স্টীম ও গরম জলের সংস্পর্শে এলে প্রতি গ্রাম জল অপেক্ষা প্রতি গ্রাম স্টীমে 540 কালরি তাপ বেশী থাকায় স্টীম দেহে বেশী তাপ দেয়। ফলে দেহ বেশী তাপ পেয়ে অধিক ক্ষত সৃষ্টি করে। অর্থাৎ 100°C উষ্ণতার জলের চেয়ে 100°C উষ্ণতার স্টীম দেহে বেশী ক্ষত সৃষ্টি করে।

22. **একখণ্ড বরফের মধ্যে একটু গর্ত করে তাতে কিছুটা জল রাখলে ঐ জল বরফে পরিণত হবে কি ? কারণ লেখ।**

একখণ্ড বরফের মধ্যে একটু গর্ত করে তাতে কিছুটা জল রাখলে জল ক্রমশ তাপ বর্জন করবে, এবং বরফ ঐ তাপ গ্রহণ করে গলতে থাকবে। বরফের উষ্ণতা অপেক্ষা জলের উষ্ণতা বেশী থাকায় জল তাপ ছাড়বে। এভাবে তাপ ছাড়তে ছাড়তে একসময় জলের উষ্ণতা বরফের উষ্ণতার সমান হবে অর্থাৎ 0°C হবে। এই জলের বরফে পরিণত হওয়ার জন্য প্রতি গ্রামে আরও 80 ক্যালরি তাপ ছাড়া প্রয়োজন। কিন্তু ঐ অবস্থায় জল জমার জন্য প্রয়োজনীয় লীন তাপ জল থেকে নিষ্কাশন করা সম্ভব নয়, কারণ জল ও বরফের উষ্ণতা সমান। তাই গর্তে রাখা জল জমে বরফে পরিণত হবে না।

23. **দুখণ্ড বরফকে একসংগে জোরে চাপ দিয়ে কিছুক্ষণ পর চাপ ছেড়ে দিলে কি হবে ? কারণ বল।**

দুখণ্ড বরফকে একসঙ্গে করে জোরে চাপ দিয়ে কিছুক্ষণ পর চাপ ছেড়ে দিলে দুখণ্ড বরফ একত্রে জুড়ে একটি খণ্ডে পরিণত হবে। চাপ দেওয়ার ফলে দুখণ্ড বরফের সংযোগ-স্থলে চাপ বৃদ্ধি পাওয়ায় বরফের গলনাঙ্ক কমে যায়। কারণ আমরা জানি বরফের গলনাঙ্ক চাপ বৃদ্ধিতে হ্রাস পায়। চাপ-যুক্ত স্থানে বরফের উষ্ণতা বরফের গলনাঙ্ক অপেক্ষা বেশী থাকায় কিছু বরফ গলে জলে পরিণত হয়। এরপর চাপ ছেড়ে দিলে সংযোগস্থলের চাপ হ্রাস পায় এবং গলনাঙ্ক বৃদ্ধি পায়। ফলে বরফ গলা জল পুনরায় জমে বরফে পরিণত হয় এবং খণ্ড দুটি একত্রে জুড়ে একটি খণ্ডে পরিণত হয়।

24. **একটি ঢিল মাটি থেকে কিছুটা তুলে ছেড়ে দেওয়া হল। ফেলার আগে, মাঝপথে এবং মাটি স্পর্শ করার ঠিক পূর্ব মুহূর্তে ঢিলটির মধ্যে কি কি শক্তি ছিল ?**

ঢিলটিকে মাটি থেকে উপরে তোলায় তার আপেক্ষিক অবস্থানের পরিবর্তন হওয়ায় তার মধ্যে কিছুটা স্থিতিশক্তি সঞ্চিত হয়। সুতরাং ঢিলটিকে উপরে তুলে ছেড়ে দেওয়ার পূর্ব মুহূর্তে ঢিল স্থির অবস্থায় থাকায় তার মধ্যে কেবল স্থিতিশক্তি থাকে। মাঝপথে পতনশীল অবস্থায় ঢিলটির মধ্যে গতি থাকায় তার মধ্যে কিছুটা গতিশক্তি থাকে। তাছাড়া তখনও মাটি থেকে উপরে থাকায় ঢিলের মধ্যে কিছুটা স্থিতিশক্তিও থাকে। অর্থাৎ মাঝখানে স্থিতিশক্তি ও গতিশক্তি উভয়েই থাকে। মাটি স্পর্শ করার ঠিক পূর্ব মুহূর্তে ঢিলটি পূর্ব অবস্থায় ফিরে আসে বলে তার মধ্যে কোন স্থিতিশক্তি থাকে না। কিন্তু সেই সময়ে ঢিলটির গতি থাকে বলে তার মধ্যে গতিশক্তি থাকে। এছাড়া প্রমাণ করা যায় পতনের যে কোন মুহূর্তে ঢিলটির স্থিতিশক্তি ও গতিশক্তির সমষ্টি ধ্রুবক।

25. কোন্ শ্রেণীর লিভারে যান্ত্রিক সুবিধা সব সময়েই 1-এর বেশী এবং কোন্ শ্রেণীর লিভারের যান্ত্রিক সুবিধা সব সময়ই 1-এর কম এবং কেন ?

দ্বিতীয় শ্রেণীর লিভারের যান্ত্রিক সুবিধা সব সময়ই 1-এর বেশী। এই লিভারে আলম্ব ও চেষ্টার মধ্যে থাকে বাধা বা ভার। যান্ত্রিক সুবিধার সংজ্ঞা থেকে পাওয়া যায়

$$\text{যান্ত্রিক সুবিধা} = \frac{\text{চেষ্টা বাহু}}{\text{বাধা বা ভার বাহু}}$$

দ্বিতীয় শ্রেণীর লিভারে চেষ্টা বাহু সব সময়েই বাধা বা ভার বাহু থেকে বড় হয়। তাই দ্বিতীয় শ্রেণীর লিভারে যান্ত্রিক সুবিধা সব সময়েই 1-এর বেশী।

তৃতীয় শ্রেণীর লিভারে যান্ত্রিক সুবিধা সব সময়ই 1-এর কম। কারণ এই লিভারের ক্ষেত্রে আলম্ব ও বাধা বা ভারের মাঝখানে থাকে চেষ্টা। তাই চেষ্টা বাহু সব সময়েই বাধা বা ভার বাহু থেকে ছোট হয়। ফলে যান্ত্রিক সুবিধা সব সময়ই 1-এর কম।

26. সিনেমার পর্দা সাদা ও অমসৃণ করা হয় কেন ?

সাদা আলোর শোষণ ক্ষমতা খুবই কম। সিনেমার পর্দা সাদা করলে এতে আলোর শোষণ হতে পারে না। ফলে অধিকাংশ আলোই পর্দা থেকে প্রতিফলিত হয়ে ফিরে আসায় প্রতিবিম্ব উজ্জ্বল হয়। এছাড়া সাদা পর্দার উপর কালো ছবি বা রঙিন ছবি পরিষ্কার ফোটে বলেও সিনেমার পর্দা সাদা করা হয়।

সিনেমার পর্দা অমসৃণ করার ফলে আপতিত আলোর নিয়মিত প্রতিফলন না হয়ে বিক্ষিপ্ত প্রতিফলন হয়। এর ফলে, ছবিগুলি যে দিক থেকেই দেখা যাক না কেন সর্বত্র সমান উজ্জ্বল দেখায়।

27. সমতল আয়নায় আলো পড়লে চকচক করে কিন্তু দেওয়ালে আলো পড়লে চকচক করে না কেন ?

সমতল আয়নার তল মসৃণ। এতে আলো পড়লে নিয়মিত প্রতিফলন হয়। ফলে আয়নার যে অংশে প্রতিফলন ঘটে সেখান থেকে অধিকাংশ আলোই প্রতিফলিত হয়ে আমাদের চোখে পৌঁছায়। তাই আয়নার ঐ অংশ চকচকে মনে হয়। কিন্তু দেওয়ালের তল অমসৃণ, দেওয়ালে আলো পড়লে বিক্ষিপ্ত প্রতিফলন হয়। ফলে প্রতিফলিত আলো চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। সেজন্য আমাদের চোখে প্রতিফলিত আলোর সামান্য পরিমাণ এসে পড়ে। তাই দেওয়াল চকচক করে না।

28. সাধারণ প্রতিফলন ও অভ্যন্তরীণ পূর্ণ প্রতিফলনের পার্থক্য কি ?

(i) সাধারণ প্রতিফলনের ক্ষেত্রে প্রতিফলকের দরকার, কিন্তু অভ্যন্তরীণ পূর্ণ প্রতিফলনের ক্ষেত্রে দুই মাধ্যমের বিভেদ তলই প্রতিফলকের কাজ করে। ফলে আলাদা কোন প্রতিফলকের দরকার হয় না।

(ii) সাধারণ প্রতিফলনের ক্ষেত্রে যে কোন মাধ্যমে যে কোন আপতন কোণের জন্য প্রতিফলন হয়। কিন্তু অভ্যন্তরীণ পূর্ণ প্রতিফলনের ক্ষেত্রে ঘনতর মাধ্যম থেকে লঘুতর মাধ্যমে আলোক সংকট কোণের চেয়ে বেশী কোণে আপতিত হলে প্রতিফলন হবে।

(iii) সাধারণ প্রতিফলনের ক্ষেত্রে আপতিত আলোর আংশিক প্রতিফলন হয়। ফলে প্রতিবিম্বের উজ্জ্বলতা কমে। কিন্তু অভ্যন্তরীণ পূর্ণ প্রতিফলনের ক্ষেত্রে আপতিত আলোর সম্পূর্ণ প্রতিফলন হয়, ফলে প্রতিবিম্বের উজ্জ্বলতা কমে না।

29. বিবর্ধক কাচ হিসাবে কোন্ লেন্স ব্যবহার করা হয়? এক্ষেত্রে লেন্স থেকে বস্তুর দূরত্ব কিরকম হওয়া উচিত?

ছোট ছোট লেখা বা অন্যান্য ক্ষুদ্র জিনিসকে বড় করে দেখানোর জন্য বিবর্ধক কাচ ব্যবহার করা হয়ে থাকে। বিবর্ধক কাচের ভেতর দিয়ে কোন জিনিসকে দেখার সময়ে জিনিসের একটি বিবর্ধক প্রতিবিম্ব পাওয়া দরকার। অবতল লেন্সের ক্ষেত্রে বস্তুর কোন অবস্থানের বিবর্ধক প্রতিবিম্ব পাওয়া যায় না। সুতরাং অবতল লেন্সকে বিবর্ধক লেন্স হিসাবে ব্যবহার করা যায় না। কিন্তু উত্তল লেন্সের ক্ষেত্রে বিবর্ধক প্রতিবিম্ব পাওয়া যায় বলে বিবর্ধক কাচ হিসাবে উত্তল লেন্স ব্যবহার করা হয়। আবার যেহেতু ছোট ছোট লেখা বা কোন বস্তুকে সঠিকভাবে দেখলে সমশীর্ষ প্রতিবিম্ব পাওয়া দরকার। তাই বস্তুর দূরত্ব লেন্সের ফোকাস দূরত্বের চেয়ে কম হওয়া দরকার। কারণ বস্তুর ফোকাস দূরত্বের চেয়ে কম হলেই বস্তুর বিবর্ধিত সমশীর্ষ ও অসদ প্রতিবিম্ব পাওয়া যাবে।

30. নীল কাচের চশমা দিয়ে সাদা ও লাল ফুলকে দেখলে কোনটিকে কিরকম দেখাবে ?

নীল কাচ সাদা আলোর নীল রঙ ছাড়া আর সব রঙই শোষণ করে। তাই যখন সাদা ফুল থেকে নির্গত সাদা আলো নীল কাচে প্রবেশ করে তখন নীল রঙ ছাড়া আর সব রঙই শোষিত হয়। ফলে আমাদের চোখে নীল রঙ এসে পৌঁছায়। সেজন্য আমরা নীল কাচের চশমা দিয়ে সাদা ফুলকে নীল দেখি।

কিন্তু লাল ফুল থেকে নির্গত লাল আলো নীল কাচের ভিতর দিয়ে যাওয়ার সময় সম্পূর্ণ ভাবে শোষিত হয়। ফলে লাল ফুল থেকে নির্গত কোন আলোই আমাদের চোখে পৌঁছায় না। তাই নীল কাচের চশমা দিয়ে লাল ফুলকে কালো দেখাবে।

৬সি নলিনী সরকার স্ট্রীট, কলিকাতা-৪

মাটি থেকে আকাশে

পার্থসারথি চক্রবর্তী

এই প্রথম ডিংকু-টিংকু ছোট্ট এরোপ্লেনে করে মাটি ছেড়ে আকাশে উঠল। আকাশ থেকে পৃথিবীর মাটির দিকে চাইতে কি মজা লাগে! দারুণ মজা তো লাগেই এছাড়া শেখাও যায় অনেক কিছু। ছোটমামা ককপিটে বসে এরোপ্লেন চালাতে চালাতে ওদের সঙ্গে গল্প করতে লাগলেন।

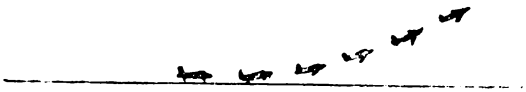

এরোপ্লেনের টেক অফ

ডিংকু জিজ্ঞেস করল—আচ্ছা ছোটমামা, বাতাসের সাহায্য নিয়েই তো এরোপ্লেন আকাশে উড়তে পারে—পৃথিবীর কত উপর পর্যন্ত এই বাতাস ছড়িয়ে আছে? ছোটমামা বললেন—পৃথিবীর পিঠের উপর রয়েছে এই বাতাসের স্তর। একেই আমরা বায়ুমণ্ডল বলে থাকি। বায়ুমণ্ডলের প্রায় শতকরা নব্বই ভাগ রয়েছে ডাঙা অথবা সমুদ্রের পিঠ থেকে দশ মাইল পর্যন্ত উঁচু। এর নাম ট্রপোস্ফিয়ার। এই ট্রপোস্ফিয়ার ছাড়িয়ে আরও চল্লিশ মাইল পর্যন্ত অঞ্চলেও বাতাস রয়েছে তবে সেটা খুবই পাতলা। এর নাম হচ্ছে স্ট্র্যাটোস্ফিয়ার। স্ট্র্যাটোস্ফিয়ার ছাড়িয়ে আরও প্রায় পাঁচশ মাইল পর্যন্ত অংশের নাম আয়নোস্ফিয়ার। এখানে বাতাস নেই বললেই চলে—অক্সিজেনও খুব কম। আয়নোস্ফিয়ার পেরিয়ে গেলে

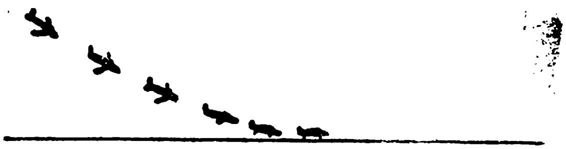

এরোপ্লেনের ল্যান্ডিং

আর বাতাসের দেখা পাবে না মোটেই—এটাকে তখন বিজ্ঞানীরা আর আকাশ বলতে চান না। তারা এর নতুন নাম দিলেন মহাকাশ। মহাকাশে উড়োজাহাজ নিয়ে যাওয়া চলে না। কারণ ওখানে বাতাস কোথায়? মহাকাশে রকেট পাঠানো হয়।

এরোপ্লেন যাঁরা চালান তাঁদের বাতাসের চাপ কোথায় কত তা অবশ্যই জানতে হবে। নীচের দিকে বাতাসের চাপ বেশী আর যতই উপরে আকাশে উঠতে থাকবে ততই বাতাসের চাপ কমবে। সাগরের উপর বায়ুমণ্ডলের চাপ কত তা জান? সাতশো ষাট মিলিমিটার। বাতাসের চাপ যে যন্ত্রের সাহায্যে মাপা যায় তার নাম হ'ল ব্যারোমিটার। সাগর থেকে পাহাড়ে ওঠো বা আরও উঁচু পর্বতশৃঙ্গে ওঠো বাতাসের চাপ ক্রমেই কমতে থাকবে।

পাইলটকে তাই বাতাসের চাপ কোথায় কম বা বেশী তা জানতে হবে। বাতাস পাতলা হলে সেখান দিয়ে উড়োজাহাজ চালাতে ভারী সুবিধা। কিন্তু বাতাস ঘন হলে তার মধ্যে দিয়ে উড়োজাহাজ চালানো চাট্টিখানি ব্যাপার নয়।

কোনও জায়গার তাপ বেশী হলে সেখানকার বাতাসও গরম হবে। গরম বাতাস ঠাণ্ডা বাতাসের চাইতে হাল্কা। তাই গরম বাতাস উপরের দিকে উঠে যায়। ওই জায়গা থেকে বাতাস সরে যায় বলে সেই অঞ্চলের চাপও যায় কমে।

আগেই জেনেছ গরম বাতাস হাল্কা হয়ে উপরে উঠে গিয়েছিল। সেখানে গিয়ে কি হবে? ওই গরম বাতাস তাপ হারিয়ে ঠাণ্ডা হবে আর সেখানে জমে থাকা ঘন বাতাসের সঙ্গে মিশে ওই এলাকায় বেশী চাপ দেবে।

তাপের সঙ্গে বাতাসের চাপ কমা অথবা বাড়ার একটা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রয়েছে। বাতাসের চেষ্টাই হ'ল সবসময় কি করে বেশী চাপের অঞ্চল ছেড়ে কম চাপের অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়তে পারে তার ফিকির খোঁজা। পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে তাই অনবরত বায়ুস্রোত বয়ে চলেছে। আবহাওয়াও রোজ এক থাকে না। ওটা বদলে যায়। ধুরন্ধর পাইলটকে তাই আবহাওয়ার খবর আগে থেকেই জেনে রাখতে হবে যেন পথে কোনও বিপদ দেখা না দিতে পারে। মেঘ বা কুয়াশার অবস্থাও কেমন তাও তাঁর জানা একান্ত প্রয়োজন।

আজকাল আবহাওয়া বিজ্ঞানের এত উন্নতি হয়েছে যে তা বর্ণনা করাও কঠিন। ইলেকট্রনিকের দৌলতে মুহূর্তের মধ্যে আবহাওয়ার পরিবর্তন আমরা একটা সুইচ টিপেই জেনে নিতে পারি। তবু বলব—প্রকৃতি এত তাড়াতাড়ি বদলে যায় যে অনেক সময় অতি শক্তিশালী নিখুঁত বৈজ্ঞানিক যন্ত্রের সাহায্যেও আমরা তা ধরতে পারি না।

অনেক সময় তোমরা কাগজে পড়ে থাক—অমুক জায়গায় দারুণ দুর্যোগ আর ঝড়বৃষ্টির জন্য সেখানকার সব বিমান যাত্রা বাতিল করে দেওয়া হয়েছে। হ্যাঁ, সত্যিই তাই। দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া থাকলে পাইলট এবং অন্যান্য এয়ারোনটিক্যাল এঞ্জিনীয়াররা যদি মনে করেন এরোপ্লেন আকাশে ওড়ানোর দরকার নেই—তখন

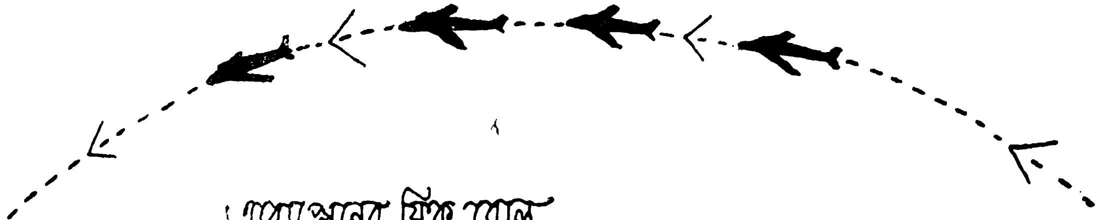

এরোপ্লেনের ফ্লিক রোল

তাঁরা বিমানযাত্রা বাতিল করে দেন। ভালই করেন—কি বল, কেননা বিপদের ঝুঁকি নেওয়ার দরকারটা কি?

এরোপ্লেন চালাতে গেলে আকাশের মেঘকেও চিনে নিতে হবে। কারণ আকাশপথে ওড়ার সময় পাইলটের সঙ্গী মেঘও তো উড়ে চলে দিক দিগন্তের পানে।

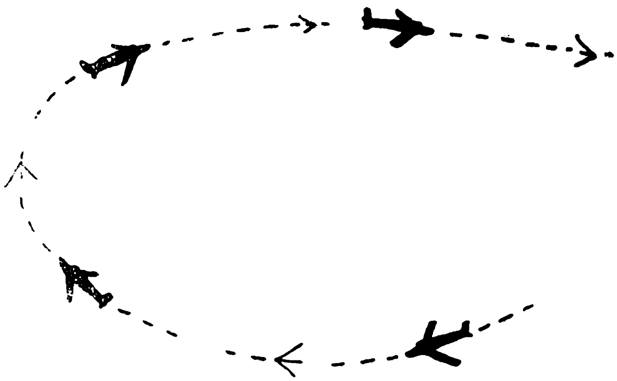

এরোপ্লেনের হাফ রোল

চার রকমের মেঘ নিয়ে আমরা আলোচনা করব এখানে। এরা হোল—১। সিরাস (Cirrus) ২। নিমবাস (Nimbus) ৩। কিউমুলাস (Cumulus) ৪। স্ট্র্যাটাস (Stratus)।

সিরাস মেঘের জায়গা হ'ল আকাশে—অনেক অনেক উঁচুতে। সাদা, ছেঁড়া তুলোর মতো চেহারা এই মেঘের। ভারী সুন্দর লাগে দেখতে নীল আকাশের ঠিক নীচে এই ছেঁড়া, সাদা মেঘের দল।

নিমবাস মেঘ হচ্ছে ঘন কালো। নিমবাস মেঘ দেখলেই অভিজ্ঞ লোক বুঝতে পারেন চারদিকে মুষল ধারায় বৃষ্টি নামবে।

গ্রীষ্মকালে আমাদের দেশে যে মেঘ সচরাচর চোখে পড়ে তা হ'ল কিউমুলাস মেঘ। স্তূপের মতো দেখতে—নীচের অংশটা বেশ কালো, এরাই হচ্ছে কিউমুলাস মেঘ। খুব ঝিরঝিরে বৃষ্টি নামে স্ট্র্যাটাস মেঘে। সারা আকাশ জুড়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকে এরা।

কোন মেঘে বৃষ্টি হয়, কোন মেঘে হয় না, কোন মেঘে প্রচণ্ড ঝড় ওঠে অথবা বৃষ্টি হয় তাও পাইলটকে জেনে রাখতে হয়। এটা অবশ্য একদিনে হয় না। দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতার ফলেই সে এটা ভালভাবে জানতে পারে।

আগেই বলেছি প্রকৃতির চেহারা এত সহজে বদলে যায় যে তা আমরা কল্পনা করতেও পারি না। আকাশে হয়ত ছিল সাদা, ছেঁড়া তুলোর মত সিরাস মেঘ। আস্তে আস্তে সেখানে এসে জমলো নিমবাস মেঘ। অথবা দু'ধরনের মেঘ একসাথে মিশে তৈরী করল নিমবাস কিউমিলা। সেইরকম সিরো-স্ট্র্যাটাস, নিমবো-স্ট্র্যাটাস ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের মেঘ অনেক সময় একে অপরের সাথে মিশে থাকে।

আকাশ পথে কখনও মেঘের ভেলাকে সাথী করে, কখনও নিবিড় বৃষ্টি ধারার মধ্যে দিয়ে, আবার কখনও বা ঘন কুয়াশার মধ্য দিয়ে এরোপ্লেন চালিয়ে পাইলট তাঁর গন্তব্যস্থলের দিকে এগিয়ে যায়। একাজে ঝুঁকি আছে নিশ্চয় তবে আনন্দও কম নয়। পাইলট অথবা অন্য কেউ যখন আকাশ থেকে মাটিতে নির্ভয়ে লাফ দেন তখনই বা মজা কম কি!

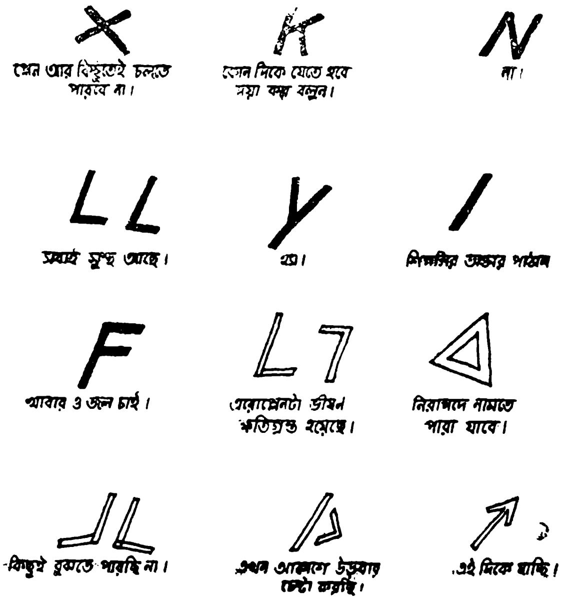

এরোপ্লেনে যেসব সংকেত চিহ্ন ব্যবহৃত হয়

ছোটদের দপ্তর

পরিচালক ঃ জয়ন্ত দত্ত

● তোমরা যারা কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞানের নিয়মিত পাঠক এবং স্কুলে পড়াশোনা করছ 'ছোটদের দপ্তরে' লেখা পাঠাতে পার। সম্পাদকমণ্ডলীর মনোনয়ন পেলে সে লেখা 'ছোটদের দপ্তরে' ছাপা হবে। তবে শব্দ সংখ্যা কিছুতেই যেন ২০০-এর বেশী না হয়। সংগে প্রয়োজন মতো ফটো বা আঁকা ছবি পাঠাবে।

● শুধু আমাদের প্রশ্নই নয়, তোমরাও ছোটদের দপ্তরে প্রশ্ন পাঠাতে পার। জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রশ্ন, পড়াশোনার প্রশ্ন, যার উত্তর আমরা পরবর্তী সংখ্যাগুলিতে প্রকাশ করব।

'বিজ্ঞান জিজ্ঞাসার' প্রশ্নের উত্তর চলিত মাসের ১৫ তারিখের মধ্যে আমাদের দপ্তরে পৌঁছানো চাই।

প্রশ্নের সংগে তোমরা নিজেদের বয়স কিন্তু উল্লেখ করবে।

তবে সব ক্ষেত্রেই চিঠি বা খামের উপরে 'ছোটদের দপ্তর' কথাটি উল্লেখ করতে হবে।

বিজ্ঞান জিজ্ঞাসার উত্তর দাতাদের নাম ঃ

সবকটি প্রশ্নের সঠিক উত্তর কেউই দিতে পারনি। প্রকাশিত উত্তরগুলি দেখে নেবে।

দশ বা দশের বেশী বিজ্ঞান জিজ্ঞাসার সঠিক উত্তর দাতাদের নাম ঃ

১। নেপাল মাল—বেরাবাড়ি, হুগলী।
২। সৌমেন পাল—শিবপুর, হাওড়া।
৩। রাজীব সামন্ত—বেলগাছিয়া, কলকাতা।
৪। প্রান্তক চক্রবর্তী—শিবপুর, হাওড়া।
৫। রমা দরিপা—ভোজুডী, ধানবাদ, বিহার।
৬। জয়া দাস—সোদপুর, কলকাতা—৮২
৭। মানস রায়চৌধুরী—শিবপুর, হাওড়া।
৮। ইন্দ্রনীল ঘোষ—২৬ এ, শরৎ ঘোষ স্ট্রীট, কলি-১৪
৯। সুব্রত ঘোষ—মানকুণ্ড—হুগলী।
১০। দীপক কুমার ষড়ঙ্গী—কাঁথি, মেদিনীপুর।
১১। সর্বানী ষড়ঙ্গী—ঐ
১২। দেবজ্যোতি ষড়ঙ্গী—ঐ
১৩। রাজেস চ্যাটার্জী—খামার গাছি, হুগলী।
১৪। সুব্রত কুমার দাস—নারায়ণপুর, পালপাড়া, ২৪ পরগণা।

প্রশ্ন-উত্তর বিভাগ

১। প্রঃ শীতকালে সাবান দেওয়া তৈল্য শূন্য চুল চিরুণী দিয়ে আঁচড়ালে চুলে যে তড়িৎ উৎপন্ন হয়, ঐ তড়িৎ কেন মাথা দিয়ে দেহের ভিতর দিয়ে মাটিতে নেমে যায় না ?

মৃগাঙ্ক মৌলি বিশ্বাস (৮ম শ্রেণীর ছাত্র)

গ্রাম + পোঃ-চৌগাছা, ভায়া—কৃষ্ণগঞ্জ, জেলাঃ—নদীয়া।

উঃ—চুল তড়িৎ অপরিবাহী বলে উৎপন্ন তড়িৎ মাথার মধ্য দিয়ে ভিতরে নেমে যেতে পারে না। কিন্তু চুলে হাত দিলেই সেই তড়িৎ হাতের মধ্য দিয়ে মাটিতে নেমে যায়।

২। প্রঃ চলন্ত ট্রেনের কামরার মধ্যে উচ্চতল থেকে কোন ভারী পদার্থ নির্দিষ্ট লক্ষ্যে না নিচে ফেলতে চাইলে তা ঐ নির্দিষ্ট লক্ষে পড়ে ট্রেন যে দিকে যাচ্ছে কেন তার বিপরীত দিকে কামরার মধ্যে পড়ে ?

সুব্রত প্রামাণিক, কারদ্বারী হুগলী।

উঃ—ট্রেন যখন সমান বেগে এগোয় (Uniform velocity) তখন চলন্ত ট্রেনের কামরার মধ্যে একটি বস্তুকে উঁচু থেকে যদি ফেলা হয় তাহলে চলন্ত কামরার মধ্যে বসে একজন দর্শক দেখবে যে বস্তুটি নির্দিষ্ট লক্ষ্যেই পড়েছে, অর্থাৎ সোজা নিচে এসে পড়ল। তবে এই ঘটনা যদি চলন্ত কামরার বাইরে থেকে কোনো লোক দ্যাখে (ধরুণ প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে কামরার জানালা দিয়ে দেখছে) তাহলে সে দেখবে ঐ বস্তুটি একটি চক্রপথে অধিবৃত্তাকারে নীচে নেমে এল। কারণ যখনই একটি বস্তু চলন্ত কামরার মধ্যে ফেলা হয়, সেই বস্তুটি কিন্তু চলন্ত ট্রেনের সমান গতিতে এগোচ্ছে বলেই কামরার মধ্যে থেকে দেখলে বস্তুটির পতনের মধ্যে কোন বিশৃঙ্খলা লক্ষ্য করা যায় না। আপনি যে ঘটনার কথা বলেছেন সেটা তখনই সম্ভব ট্রেন তখন ত্বরণ লাভ করছে (accelarate)। এ ক্ষেত্রে বস্তু-হাত থেকে ছাড়ার সময় যে বেগে সামনের দিকে এগোচ্ছিল তারপরে ট্রেনের বেগ থেকে বেড়ে যায় তার ফলে কামরার মেঝে স্পর্শ করার আগেই বস্তুটির যতটা সামনের দিকে এগোতে পারে কামরার মেঝে তার চেয়ে বেশি এগিয়ে যায়। ফলে, মনে হয়, বস্তুটি কামরার মধ্যে ট্রেনের গতির বিপরীত দিকে এসে পড়ল।

একটি ইলেকট্রিক মডেল

জ্যোতিষ সরকার

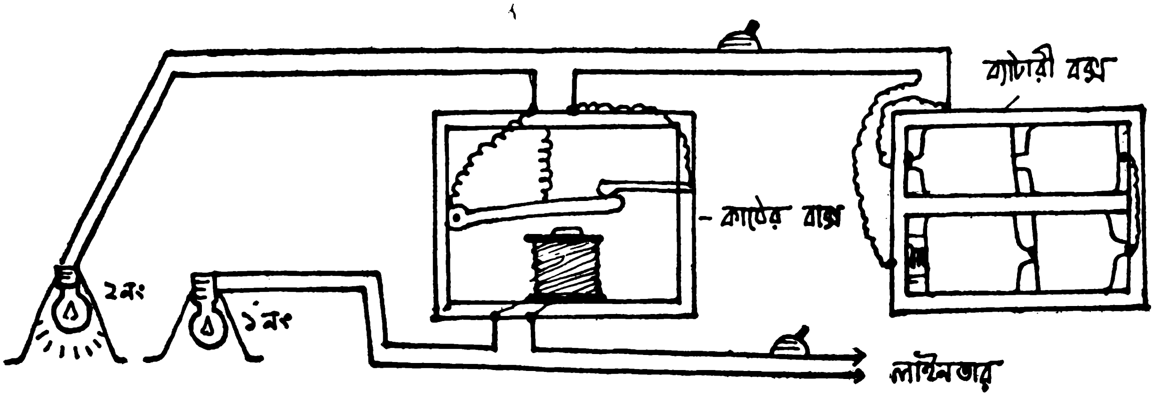

(লোড শেডিং চলা কালীন অবস্থা)

আজ তোমাদের এমন একটা মডেল তৈরী করাতে শেখাবো যার দ্বারা লোডশেডিং হওয়া সত্ত্বেও তোমার ঘরে বাতি জ্বলবে। অবশ্য একটি আলো নেভার সাথে সাথেই আর অন্য একটি আলো জ্বলে উঠবে।

মডেলটা তৈরীর জন্য যা যা জিনিসের দরকার সেগুলি হ'ল—(১) তিন ইঞ্চি ×চার ইঞ্চি সাইজের কাঠের বাক্স (২) দেড় ইঞ্চি কাঁচা লোহার উপর জড়ানো অন্তরিত তারের (সলিনয়েডের) একটি কুণ্ডলী (৩) দুইটি লোহার পাত—একটি তিন ইঞ্চি অন্যটি দেড় ইঞ্চি (৪) একটি ছোট স্প্রিং এবং (৫) ব্যাটারীর বাক্স।

কাঠের বাক্সের মধ্যে কুণ্ডলীটা বসাও। ঠিক তার ওপরেই আনুভূমিকভাবে লোহার বড়ো পাতটাকে রাখতে হবে। এটার একটা প্রান্ত বাক্সের পার্শ্ব-দেয়ালে এমনভাবে আটকানো থাকবে যেন অপর প্রান্ত স্বচ্ছন্দে নড়াচড়া করতে পারে। আর ছোট পাতটা বাক্সের বিপরীত দেয়ালে অপেক্ষাকৃত একটু উপরে দৃঢ়ভাবে আটকাবে। একটা স্প্রিং দিয়ে বড়ো পাতটার মধ্যখানে বেঁধে উপরের দেওয়ালে টান টান করে বাঁধো যেন সেটা উপরে উঠে ছোট পাতটার সঙ্গে আটকে থাকে। লোহা দুইটির স্থির প্রান্ত থেকে দু'টি তার যুক্ত করতে হবে। অতএব তোমার তৈরী এই মডেলটি থেকে এই দু'টি এবং কুণ্ডলীর দু'টি, মোট চারটি তার বের হবে। মনে রাখবে কুণ্ডলীর তার দুইটি 'লাইন তার' এবং অপর তার দুইটি 'ব্যাটারী বাক্সের' জন্য ব্যবহার করতে হবে।

একটা কথা বলে রাখি, লোডশেডিং-এর সময় তোমার বাতি জ্বালানোর জন্য ইলেকট্রিসিটি সাপ্লাই দেবে ব্যাটারী বক্স। সুতরাং তখন যে নতুন বাতিটি জ্বলবে তার 'শক্তি' অনুযায়ী ব্যাটারী বক্সে ভোল্ট বাড়ানোর জন্য হাই পাওয়ারের ব্যাটারী ব্যবহার করতে হবে।

এখানে দেখবে দুটো সুইচ ব্যবহৃত হয়েছে। উপরেরটি তখন 'অন' করবে, যে ক্ষেত্রে মনে করবে সব সময় আলো জ্বলা উচিত। নিচেরটি সাধারণ।

এখন মডেলটার কার্যকারিতা সম্বন্ধে আলোচনা করা যাক। যখন লাইন তারে বিদ্যুৎ কুণ্ডলীটির ভেতর দিয়ে প্রবাহিত হবে। ফলে কাঁচা লোহাটি চুম্বকে পরিণত হবে এবং স্প্রিং লাগানো লোহার পাতটি আকর্ষণ করবে।

অপরদিকে ব্যাটারী বাক্সের সঙ্গে ২নং আলোটা যুক্ত থাকলেও লোহা-পাত দুইটির মধ্যে সংযোগ না থাকায় সেটা জ্বলবে না। লোডশেডিং হলে অর্থাৎ লাইন তারে বিদ্যুৎ না থাকলেও কুণ্ডলী তার চুম্বকত্ব হারিয়ে ফেলবে এবং বড়ো পাতটা স্প্রিং-এর টানে উপরে উঠে যাবে। ফলে ব্যাটারী বক্সের সঙ্গে দ্বিতীয় আলোটার বৈদ্যুতিক যোগাযোগ ঘটায় সেটা জ্বলে উঠবে। আবার যখন লাইন তারে বিদ্যুৎ আসবে তখন একই পদ্ধতিতে দ্বিতীয় আলোটি নিভে প্রথমটি জ্বলে উঠবে।

একাদশ শ্রেণী,
পোঃ—খড়িবাড়ী, জেলা · দার্জিলিং

(গত সংখ্যার বিজ্ঞান-জিজ্ঞাসার সমাধান)

১। পদার্থের আপেক্ষিক গুরুত্ব নির্ণয়ের কাজে 'হাইড্রোমিটার' যন্ত্র ব্যবহৃত হয়।

২। যুক্তরাষ্ট্রের বিজ্ঞানী 'হোল্ট' ট্র্যাকটর আবিষ্কার করেন।

৩। 'ডরমিন' নামক হর্মোন উদ্ভিদের বৃদ্ধি প্রতিরোধ করে।

৪। উদ্ভিদ বিজ্ঞানের ভাষায় ভুট্টার নাম Zeo mays (linu).

৫। দাঁতের মধ্যে কোন গর্ত করতে হ'লে যে বিশেষ ধরনের যন্ত্র ব্যবহৃত হয় তারই নাম 'ক্যাভিট্রন'। এর সূঁচের মত অগ্রভাগটিকে শব্দোত্তর তরঙ্গ দ্বারা উচ্চ কম্পাঙ্কে কম্পিত করা হয়।

৬। বৃহস্পতি গ্রহের তেরোটি উপগ্রহ আছে।

৭। জার্মান রসায়নশাস্ত্রবিদ্ জাস্টাস ভন্ লিবিগ 1832 সালে 'ক্লোরাল' নামক জৈব যৌগটি আবিষ্কার করেন।

৮। Indian Space Research Organisation এর সংক্ষিপ্ত নাম ISRO.

৯। 76 বছর অন্তর হ্যালির ধূমকেতু দেখা যায়।

১০। হ্যালির ধূমকেতু শেষবার দেখা গেছে 1910সালে।

১১। 'পেঙ্গুইন' পাখির দেহ থেকে বর্জিত পদার্থ 'গুয়ানো' কৃষিকাজে সার হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

১২। সিগমণ্ড ফ্রয়েড (1856-1939) অস্ট্রীয়া দেশীয় এক বিখ্যাত মনোবিজ্ঞানী ছিলেন।

১৩। তড়িৎ-চৌম্বক আবেশের সূত্র আবিষ্কার করেন মাইকেল ফ্যারাডে।

১৪। ইঁদুর মক্ষিকা প্লেগ রোগের বাহক।

১৫। 'পোলিও' হলো সুষুম্না কাণ্ডের ধূসর বর্ণের অংশের প্রদাহজনিত রোগ। ভাইরাসের সংক্রমণে এই রোগ হয়।

ভেবে বলো উত্তর (জানুয়ারী-৮২)

(১) ওয়ালরাস

(২) আয়োডিন থাইরয়েড গ্রন্থি কর্তৃক থাইরক্সিন নিঃসরনকে নিয়ন্ত্রণ করে।

(৩) কৃত্রিম জিন সম্পর্কে।

(৪) প্রোটীন জাতীয়।

(৫) শেওলা জাতীয়।

(৬) বনমানুষ—গিবন।

(৭) ১৮৪৪ জনওয়াকার।

(৮) কাইটিন।

(৯) আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায়।

(১০) বাঁদিকে—বুলডগ্ (কুকুর)।
ডানদিকে—কোলি (কুকুর)।

মানব দেহ সম্পর্কিত প্রশ্নোত্তর

তন্দ্রা ঘোষ

(১) আমাদের ঘাম হয় কেন ?

উঃ—গরমকালে অথবা একটানা খুব পরিশ্রম করলে আমাদের দেহ তার স্বাভাবিক তাপের (98·4 F) চেয়ে বেশী গরম হয়ে পড়ে। তখন সেই গরম হ্রাস করে স্বাভাবিক তাপে আনা দরকার হয়। তখন আমাদের দেহ থেকে ঘাম বেরিয়ে যায়।

(২) মাত্র এক পা এগিয়ে যেতে মানুষ তার দেহের কতগুলি পেশী ব্যবহার করে।

উঃ—মাত্র এক পা এগিয়ে যেতে মানুষ ১০৮টি পেশী ব্যবহার করে।

(৩) হাসতে ও ভ্রূকুটি করতে কতগুলি পেশী সংকুচিত হয়।

উঃ—হাসতে ১৩টি ও ভ্রূকুটি করতে ৫০টি পেশী সংকুচিত হয়।

(৪) আমরা চোখের পলক ফেলি কেন ?

উঃ—চোখ শুকিয়ে গেলে আমরা ভালো দেখিতে পাই না। তাই চোখের পর্দা ভেজাবার জন্য অশ্রুগ্রন্থি আছে। চোখের পাতা পড়লেই অশ্রুগ্রন্থি থেকে রস বেরিয়ে চোখের পাতা ভিজিয়ে দেয়।

(৫) তোত্‌লামির কারণ কি ?

উঃ—মুখের ও জিভের মাংসপেশী স্বাধীন ভাবে বা মুক্ত অবস্থায় থাকলে, কারও অধীনে না থাকলে মানুষের তোত্‌লামি হয়।

(৬) চোখের পাতা পড়তে কত সময় লাগে ?

উঃ—১ সেকেণ্ডের ১৬ ভাগের এক ভাগ সময়।

(৭) আমাদের ঘুম পায় কেন ?

উঃ—বেশী পরিশ্রম করলে স্নায়ুতন্ত্র ক্লান্ত হয়ে পড়ে। মস্তিকে আর ঠিক মতো রক্ত চলাচল করে না। মস্তিস্ক দুর্বল হয়ে পড়ে। তখন আমাদের ঘুম পায়। কিছুক্ষণ ঘুমবার পর স্নায়ুতন্ত্র পুনরায় সতেজ হলে আমরা জেগে উঠি।

(৮) দৌড়লে হাঁপাই কেন ?

উঃ—বেশীক্ষণ দৌড়লে আমাদের দেহের ভিতর অক্সিজের গ্যাস অনেকটা ব্যয়িত হয়। তখন আমরা হাঁ করে বাতাস নিয়ে সেই অক্সিজেন গ্যাস পূরণ করতে চাই। তাতেই আমরা হাঁপাই।

মানকুণ্ডু, হুগলী।

চাঁদে ওলিম্পিক

প্রদীপ্ত সরকার

সেদিন চাঁদের মহাকর্ষ সম্বন্ধে বিজ্ঞান বই পড়ছিলাম। পড়তে বিশেষ ভাল লাগছিল না। যখন দেখলাম যে আমার পড়ার ঘরে কেবলমাত্র আমিই আছি তখন ধীরে ধীরে খবরের কাগজটা টেনে নিলাম। ধীরে ধীরে খবরের কাগজের খেলার পাতাটা ওলটালাম। ঘটনাটা প্রায় দেড় বছর আগের। তখন মস্কো শহরে ওলিম্পিকের আসর বসেছে।

যাই হোক খেলার পাতা খুলতেই আমার চোখ পড়ল একটা খবরে। খবরটির হেড লাইনে লেখা ছিল— "হকি ছাড়া অন্য সকল প্রতিযোগিতাতে ভারত ব্যর্থ হয়েছে" খবরটি একেবারে আগাগোড়া পড়ে ফেললাম। খবরটা পড়ে আমার একটু দুঃখ হল। "আমার মাতৃভূমি ভারত কি না মাত্র একটা স্বর্ণপদক নিয়ে দেশে ফিরবে!" মনে মনে আমি ভাবলাম।

যে এইরকম ভেবেছি জানিনা…হঠাৎ এক সময় আমি ঘুমিয়ে পড়লাম।

*   *   *   *

……হঠাৎ……একী…এ আমি কোথায়? আমার চোখের সামনে সহসা ভেসে উঠল ওলিম্পিকের ছবি।… আমি ওলিম্পিক দেখছি। কিন্তু সে ওলিম্পিক পৃথিবীর ওলিম্পিক নয়; আমি চাঁদের ওলিম্পিক দেখছি। মনে মনে ভাবলাম "কি মজা! আমার জীবনের স্বপ্ন আজ সার্থক হচ্ছে।" সত্যই আমার জীবনের স্বপ্ন ছিল ওলিম্পিকের খেলাধূলা দেখা।

প্রথমে দেখলাম ওয়েট লিফটিং প্রতিযোগিতা। ১৩½ কেজি বিভাগের প্রতিযোগিতা দেখলাম। যাদের ওজন ১৩½ কেজি বা তার কম তারাই কেবল এই প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে পারবে। অবশ্য চাঁদে যার ওজন ১৩½ কিলোগ্রাম, পৃথিবীতে তার ওজন প্রায় বিরাশি কিলোগ্রাম! অর্থাৎ বলা যায় ৮১ কি.গ্রা. বিভাগের প্রতিযোগিতা দেখলাম। ওয়েট লিফটিং প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকার করলেন Yurik Vardanyan; তিনি ১০৬৫

হঠাৎ মনে হল আমি যদি কোনোদিন "ওলিম্পিক" দেখতে পারতাম তাহলে কি আনন্দই না হত। কতক্ষণ

কিলোগ্রাম ওজন তুলেছিলেন। আমি অবাক হয়ে গেলাম। কারণ ১৩½ কি.গ্রা. ওজনের কোনো লোক যে ১০৬৫

কি.গ্রা, ওজন তুলতে পারে তাহা আমার জানা ছিল না। কিছুক্ষণ পরে অবশ্য বুঝতে পারলাম যে আমি এখন চাঁদের বাসিন্দা। আরও বুঝলাম, যে মানুষ পৃথিবীতে ১৭৭½ কিলোগ্রাম ওজন তুলতে পারে সে নিশ্চয়ই চাঁদে ১০৬৫ কিলোগ্রাম ওজন তুলতে পারবে; কারণ চাঁদের আকার পৃথিবীর প্রায় ⅙ অংশ; তাই চাঁদের মাধ্যাকর্ষণ শক্তিও পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তির ছয় ভাগের এক ভাগ মাত্র। এরপর শুরু হল "হাইজাম্প" প্রতিযোগিতা। "হাইজাম্প" প্রতিযোগিতায় যে প্রথম হল সে ৮৫ ফুট হাইজাম্প দিয়েছিল—অর্থাৎ সে একলাফে আট তলা বাড়ীতে উঠতে পারে। দ্বিতীয় স্থানাধিকারীও একলাফে আট তলা বাড়ীতে উঠতে পারে। সে ৮৪ ফুট হাইজাম্প দিয়েছিল।

পৃথিবী অপেক্ষা চাঁদে বহু সুবিধা আছে। চাঁদে এমনই সুবিধা যে পৃথিবীতে কোন লোক এক ফুট হাইজাম্প দিতে পারলে চাঁদে সে ছয় ফুট হাইজাম্প দিতে পারবে। এরও কারণ একই—পৃথিবী অপেক্ষা চাঁদের আকার অনেক ছোট।

চাঁদে গিয়ে আমি অনায়াসে লাফ দিয়ে একতলা বাড়ীর ছাদে উঠছি। তারপর এক বাড়ী থেকে অন্য বাড়ীর ছাদে লাফ দিচ্ছি। সেই সব বাড়ীর লোকেরা "চোর চোর" বলে আমাকে তাড়া করলে আমি হনুমানের মতো একটা গাছে উঠে সেখান থেকে অন্য একটা গাছে লাফ দিচ্ছি। তারপর যখন লোকেরা পালিয়ে যাচ্ছে আমিও তখন গাছ থেকে নেমে পড়ছি। আমি একলাফে কয়েকটা নদীও পার হয়েছিলাম। যাই হোক আমার মনে খুব আঘাত লাগল। আমি কখনও কারো জিনিস চুরি করিনি কিন্তু আমি ঐ ভাবে লাফাচ্ছিলাম দেখে কিছু লোক আমাকে চোর অপবাদ দিল? একী সহ্য করা যায়? তাই আমি ঠিক করলাম আর কোনোদিন আমি লাফ দিয়ে কোনো বাড়ীর ছাদে উঠব না।

চাঁদে গিয়ে আমি বেশ সুখে আছি। একটা বিরাট হোটেলের একটা ঘরে আমি থাকি। সেই ঘরে আরামের সব রকম ব্যবস্থাই আছে। শোবার ঘরটা "এয়ার কণ্ডিশান।" তাছাড়া কম দামে বেশ ভাল খাবারই দিচ্ছে হোটেলটি। প্রত্যেকটি ঘরেই নাইট ল্যাম্পের ব্যবস্থা আছে। বলতে গেলে আমি যেন এক রূপকথার রাজ্যে বাস করছি।

পরের দিন তীর ছোঁড়া ও বর্শা ছোঁড়ার প্রতিযোগিতা দেখলাম। যে প্রতিযোগী বর্শা ছোঁড়ার প্রতিযোগিতার প্রথম স্থান অধিকার করলেন তিনি তিনশ আশি ফুট দূরে বর্শা ছুঁড়লেন। আমি প্রথমে অবাক হলেও কিছুক্ষণ পরে আমি আবার বুঝতে পারলাম যে আমি এখন চাঁদে। চাঁদে নাকি অসম্ভবও সম্ভব হয়।

রাইফেল শুটিং প্রতিযোগিতার শেষে আমি হাততালি দিয়ে উঠলাম। এর আগে পর্যন্ত কোনো প্রতিযোগিতাতেই ভারত স্বর্ণপদক লাভ করেনি। এই

প্রথম জন্মভূমির একজন প্রতিযোগী স্বর্ণপদক লাভ করলেন। আমার বুক যেন গর্বে ভরে উঠল। আমার কাছে একটি ক্যামেরা ছিল। আমি আমার দেশের সেই প্রতিযোগীর ছবি তুললাম। তারপর আমি অন্য কয়েকটি বিষয় দেখে হোটেলে ফিরে এলাম।

চাঁদে গিয়ে আমি একবার নিজের ওজন নিয়েছিলাম। নিজের ওজনের বাহার দেখে তো আমি মাথা ঘুরে পড়ে যাচ্ছিলাম। ভাগ্যিস এক ভদ্রলোক আমাকে বাঁচালেন। তিনি বললেন "তোমার বয়সী একটি ছেলের পক্ষে পাঁচ কিলোগ্রাম ওজন যথেষ্ট। কারণ পৃথিবীতে তোমার ওজন প্রায় তিরিশ কিলোগ্রাম।"

"সত্যিই তো, আমি কিরকম বোকা। আমি যে এখন চাঁদের বাসিন্দা সে কথা প্রায়ই ভুলে যাচ্ছি।" আমি বললাম।

ভদ্রলোক বললেন "শুধু তুমি কেন? অনেকেই এত আনন্দ আর চেঁচামেচির মধ্যে ভুলে যায় যে সে চাঁদের বাসিন্দা।"

আমি হকি, লংজাম্প ও দৌড় প্রতিযোগিতা দেখলাম। দৌড় প্রতিযোগিতার প্রতিযোগিদের মধ্যে একটা প্রবণতা আমি বিশেষভাবে লক্ষ্য করছিলাম। বেশীর ভাগ প্রতিযোগিই নির্দিষ্ট পথ দৌড়িয়ে অতিক্রম না করে দশ বারোটা লংজাম্প দিয়ে অতিক্রম করল। এইভাবে নির্দিষ্ট পথ অতিক্রম করতে তাদের খুব কম সময় লাগছিল।

পরের দিন ফুটবল ফাইনাল। টিকিটের লম্বা লাইন পড়েছে টিকিট ঘরের সামনে। ভাগ্য ভাল, আমি একটা টিকিট পেয়ে গেলাম। কিন্তু টিকিট পাওয়া লোক অপেক্ষা টিকিট না পাওয়া লোকের সংখ্যাই ছিল বেশী।

যাই হোক টিকিট পেয়েছি বলে আমার খুব আনন্দ হল। নির্দিষ্ট সময়ে মাঠে ঢুকলাম। কিন্তু মাঠের দুপাশের গোলপোস্ট দেখে আশ্চর্য হলাম। হঠাৎ আমার নজরে পড়ল একটা পোস্টার। পোস্টার পড়ে আমার বিস্ময় ভাব কেটে গেল। পোস্টারে লেখা ছিল ঃ—

যে গোলকীপার পৃথিবীতে আট ফুট উঁচু গোলপোস্ট স্পর্শ করতে পারে সে চাঁদে অবশ্যই ৪৮ ফুট উঁচু গোলপোস্ট স্পর্শ করবে।

পোস্টারের লেখা যে সত্য তাহা প্রমাণিত হল খেলা শুরু হওয়ার পর। আমি অবাক হয়ে দেখলাম যে দুই দলের গোলকীপারই স্বচ্ছন্দে ৪৮ ফুট উঁচু গোল রক্ষা করতে পারছেন। খেলায় জিতল একটি ইউরোপীয় দল।

হ্যাঁ হ্যাঁ পৃথিবীবাসীরাই চাঁদে ওলিম্পিকের আয়োজন করেছে। পৃথিবী ছেড়ে চাঁদে ওলিম্পিক করার কারণ কি? কারণ আছে বৈ কী। পৃথিবীর কোনো একটি দেশে ওলিম্পিক হলে কিছু কিছু দেশ সেই প্রতিযোগিতায় যোগ দেয় না। কিন্তু চাঁদে ওলিম্পিক হলে সব দেশই যোগ দেবে। সুষ্ঠুভাবে ক্রীড়ানুষ্ঠান সম্পন্ন হবে। তাছাড়া স্টেডিয়াম হিসাবে সমগ্র চাঁদকে ব্যবহার করা যেতে পারে। পৃথিবীতে অতবড় স্টেডিয়াম কোথায়?

* * * *

কুস্তি ও অন্যান্য কয়েকটি খেলাও দেখলাম। হঠাৎ শুনলাম মার ডাকাডাকি "ওরে ওঠ, পড়তে বসে যে ঘুমিয়ে পড়েছিস।" মার ডাকাডাকিতে আমার ঘুম ভেঙে গেল। হেঃ হেঃ......আমি এতক্ষণ স্বপ্ন দেখছিলাম...।

অষ্টম শ্রেণী
কানাইলাল বিদ্যামন্দির, চন্দননগর, হুগলী।

কিশোরদের জন্য অষ্টম রাজ্য বিজ্ঞান প্রদর্শনী

আগামী ৪ ফেব্রুয়ারী থেকে ১০ দিনের জন্যে জওহর শিশুভবনের সংলগ্ন প্রাঙ্গণে কিশোরদের জন্য অষ্টম রাজ্য-স্তরের বিজ্ঞান প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছে। ভারত সরকারের শিক্ষামন্ত্রকের শিক্ষা ও গবেষণা প্রশিক্ষণের জাতীয় পরিষদ এবং জওহর শিশু ভবন এই প্রদর্শনীর ব্যবস্থাপক। বিভিন্ন বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী ও বিজ্ঞান ক্লাবের সভ্য-সভ্যাদের তৈরী বৈজ্ঞানিক মডেল এই প্রদর্শনীতে স্থান পাবে। প্রতিবেশী মিত্র রাষ্ট্র বাংলা-দেশও অংশ গ্রহণ করবে।

৪ ফেব্রুয়ারী অপরাহ্নে এই প্রদর্শনীর উদ্বোধন করবেন পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল ভৈরবদত্ত পাণ্ডে। প্রদর্শনীতে অংশ গ্রহণকারীদের যেসব দল বিজয়ী হবে তাদের প্রায় ৪ হাজার টাকার বৃত্তি ও স্মারকদ্রব্য দিয়ে উৎসাহিত করা হবে এবং এবং তারা নয়াদিল্লীতে জাতীয় বিজ্ঞান প্রদর্শনীতে অংশ গ্রহণের সুযোগ পাবে।

ভেবে বল কোনটা ঠিক

শ্রীচন্দনকুমার রুদ্র

১। সময়ের সাপেক্ষে অবস্থান পরিবর্তনের হারকে বলা হয়—(ক) বেগ, (খ) দ্রুতি; (গ) সরণ।

২। পরমাণু নিউক্লিয়াস হইতে তাহার নিকটতম ইলেকট্রন কক্ষপথের (K-orbit) দূরত্ব হলো—(ক) 0.529×10^{-8}, (খ) $5{\cdot}6 \times 10^{-13}$, (গ) $1{\cdot}675 \times 10^{-24}$ সে. মি.।

৩। পদার্থের ক্ষুদ্রতম কণাকে 'অ্যাটম' নামে অবিহিত করেন (ক) বৃটিশ বিজ্ঞানী ডলটন (খ) গ্রীক দার্শনিক ডিমোক্রিটাস.

৪। এক্স-রে রশ্মি আবিষ্কারক (ক) জেমসভিউয়র, (খ) এডিসন, (গ) রনজেন।

৫। F P. S. পদ্ধতিতে ভরের এককে বলা হয় (ক) গ্রাম, (খ) পাউণ্ডাল, (গ) ফুট।

৬। নিউট্রন বোমার আবিষ্কারক, (ক) অটোহ্যান, (খ) লিজে মাইটনার, (গ) স্যামুয়েল টি—কোহেন ডাচ।

৭। রক্তসংবহন পদ্ধতির আবিষ্কারক (ক) ডাঃ উইলিয়াম হার্ভে, (খ) এ্যান্টন ফন লিউক্রাহক, (গ) গুয়ার নিকার।

৮। রিকেক রোগের মূল কারণ হল শরীরে (ক) ভিটামিন 'সি', (খ) ভিটামিন 'ডি', (গ) ভিটামিন 'এ' এর অভাব।

৯। অগ্নাশয় হইতে নিঃসৃত হরমোনের নাম (ক) কাইনেটিন (খ) ইনসুলিন (গ) প্রস্টাগ্ল্যাণ্ডলিন।

১০। চক্ষুর উপরের স্বচ্ছ পদার্থটিকে বলা হয় (ক) কর্ণিয়া, (খ) কণজাঙ্কটিভা, (গ) কণীনিকা।

১১। ডেঙ্গুজ্বর-এর রোগ জীবাণু বহন করে (ক) কিউলেক্স, (খ) এডিস, (গ) অ্যানোফিলিস।

১২। গ্রাহক হইতে উদ্দীপনা বহনকারী গার্ভগুলিকে বলে (ক) অন্তমুর্খ নার্ভ, (খ) বহিমুর্খ নার্ভ।

১৩। বংশগতির ধারক ও বাহক (ক) সাইটোপ্লাজম, (খ) সেণ্ট্রোজোম, (গ) জিন।

১৪। জীবদেহে কোষের সংখ্যা যে পদ্ধতিতে বৃদ্ধি পায় তাহার নাম (ক) মাইটোসিস, (খ) মায়োসিস (গ) অ্যামাইটোসিস।

সমাধান ঃ—১। (খ), ২। (ক), ৩। (খ), ৪। (গ), ৫। (খ), ৬। (গ), ৭। (ক), ৮। (খ), ৯। (খ), ১০। (খ), ১১। (খ), ১২। (ক), ১৩। (গ), ১৪। (ক),

বাঁশদ্রোণী চাকদহ পেয়ারাবাগান, পোঃ—বাঁশদ্রোণী,

বিজ্ঞান জিজ্ঞাসা

শ্রীবৈজ্ঞানিক

১। আফিম্ এ উপস্থিত মূল রাসায়নিক পদার্থটির নাম কি?

২। লাল রঙের কোন্ রঞ্জক পদার্থ সিল্ক, উল ইত্যাদি রঞ্জিত করতে ব্যবহৃত হয়?

৩। কোন্ পতঙ্গের দেহে ফরমিক অ্যাসিড থাকে?

৪। কোন্ মৌলের পরমাণু-ক্রমাংক ৪২?

৫। মোনাজাইটে কোন্ তেজস্ক্রিয় ধাতু পাওয়া যায়?

৬। রক্তে কোন ধাতু থাকে?

৭। তেজস্ক্রিয়তার এককের নাম কি?

৮। কোন্ গ্যাস বর্ণহীন অথচ অত্যন্ত বিষাক্ত?

৯। কোন ধাতুর উপর আলোক পড়লে ঐ ধাতুর রোধ কমে যায়?

১০। বৈদ্যুতিক ইস্ত্রির মধ্যে কোন্ সংকর ধাতুর তার কুণ্ডলী থাকে?

১১। কোন্ যন্ত্রের মূল নীতি বার্লোচক্রের অনুরূপ?

১২। 'কোবাল্ট' কি চৌম্বক পদার্থ?

১৩। তাপীয় আয়ননবাদের আবিষ্কর্তা কে?

১৪। রাবার সদৃশ পলিমার কোনটি?

১৫। 'নেপচুন' আবিষ্কার করেছিলেন কোন্ জ্যোতির্বিদ?

সঠিক উত্তর দাতাদের মধ্যে প্রথম দশজনের নাম ছাপা হবে

বিজ্ঞানের শব্দকূট ● স্বাতী রায়

গত সংখ্যার সমাধান

১। পি	৩। থ্যা	৪। গো	২। য়া	৭। স
	মৌ	ল্ড	বা	ল্ট
	মি		র	কে
৬। মি	টা	র		ক
	৫। র	স্বা	স	

হাবুলের বিজ্ঞান-ভাবনা

ধীরেন বল

কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞান

নিয়মাবলী

গ্রাহকদের জন্য

- কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞান প্রতি ইংরাজী মাসের গোড়ায় প্রকাশিত হয়।
- প্রতি সংখ্যার মূল্য ২ টাকা। বারো মাসের বৈশাখ–চৈত্র গ্রাহক চাঁদা ২০ টাকা। শারদসংখ্যার মূল্য পৃথক।
- গ্রাহকদের ডাকমাশুল লাগবে না। **under certificate of posting**-এ গ্রাহকদের বই পাঠানো হবে। যারা রেজিস্ট্রী ডাকে নেবেন তাদের অতিরিক্ত ৩০ টাকা পাঠাতে হবে।
- **M. O.** বা **Bank Draft KISHORE JNAN-BIJNAN**-এর নামে পাঠাতে হবে।

এজেন্টদের জন্য

- ১০ কপির কমে এজেন্সী দেওয়া হয় না। কমিশন শতকরা ২৫ টাকা।
- ভি. পি. বা ব্যাঙ্ক মারফৎ পত্রিকা পাঠানো হবে। ডাক-মাশুল লাগবে না।
- এজেন্টদের অর্ডার অনুযায়ী সংখ্যা পিছু ১ টাকা করে অগ্রিম জমা রাখতে হবে।
- এলাকা ভিত্তিক এজেন্সীর জন্য সাক্ষাতে অথবা চিঠিতে যোগাযোগ করুন।

লেখকের প্রতি

- বিদ্যালয় পর্যায়ের ছাত্র-ছাত্রী এবং সর্বসাধারণের উপযোগী জনপ্রিয় বিজ্ঞানের রচনা কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞানে প্রকাশিত হবে। লেখার ভাষা ছোটদের উপযোগী এবং লেখার ভঙ্গি সহজবোধ্য হওয়া প্রয়োজন।
- ফুলস্ক্যাপ কাগজের একপিঠে বাঁদিকে মার্জিন রেখে স্পষ্ট হস্তাক্ষরে লেখা পাঠাতে হবে।
- আনুমানিক শব্দসংখ্যা ২৫০০।
- লেখার সঙ্গে উপযুক্ত ছবি (লাইনড্রয়িং/হাফটোন)-যুক্ত থাকা প্রয়োজন।
- রচনার শেষে লেখকের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি যুক্ত থাকা প্রয়োজন।
- প্রকাশিত রচনার বিষয়ে সর্বপ্রকার দায়িত্ব লেখকের, কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞান কর্তৃপক্ষের নয়।
- অমনোনীত রচনা ফেরত দেওয়া সম্ভব নয়।
- যে কোন বিষয়ে আলোচনার জন্য সম্পাদকীয় দপ্তরে যোগাযোগ করতে হবে।

সম্পাদক : কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞান

R/N No37390/81 KISHORE JNAN-BIJNAN • February 1982 Regd No WBCC/50

ছোটদের বই

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর
তেপান্তর ১৫·০০

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
ছোটদের কাশীনাথ ৬·০০

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়
কিশোর অপু ১৫·০০
অপুর ছেলেবেলা ৬·০০
ছোটদের অপরাজিত ৬·০০

তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
ছোটদের কাজল ৬·০০

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়
ছোটদের সন্দীপন পাঠশালা

ঘনাদা ও টেনিদার গল্প

প্রেমেন্দ্র মিত্র
ঘনাদার জুড়ি নেই ৫·০০
মঙ্গলগ্রহে ঘনাদা ৫·০০
ঘনাদা বিচিত্রা ১৫·০০

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়
টেনিদার অভিযান ১৫·০০
চারমূর্তি ৫·০০
ঝাউবাংলোর রহস্য ৫·০০
কম্বল নিরুদ্দেশ ৫·০০

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়
হাতিচোর ৬·০০

সুজিতকুমার নাগ
কিশোর রচনাসমগ্র ১০·০০

দক্ষিণারঞ্জন বসু
কায়াহীনের কবলে ৪·০০
হট যাও হার্মাদ ৫·০০

শিশির ঘোষ
লাহুল সিংহের সন্ধানে ৬·০০

ধীরেন বল
হাস্যকর ৫·০০

দীনেন্দ্রকুমার রায়
যখের আসন ৬·০০

স্যার কোনান ডয়েল
কিশোর গোয়েন্দা গল্প ৭·০০
কিশোর রহস্য গল্প ৭·০০

উপেন্দ্র কিশোর রায়চৌধুরী
গুপী গাইন বাঘা বাইন ৫·০০

ধীরেন্দ্রলাল ধর
দুরন্ত যাত্রী ৮·০০

শৈব্যা প্রকাশন বিভাগ
৮/১সি, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলি ৭৩

কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞানের পক্ষে রবীন বল কর্তৃক ৮/১এ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা ৭৩ হইতে প্রকাশিত এবং ৬ শিবু বিশ্বাস লেন, কলকাতা ৬, তাপসী প্রিন্টার্স হইতে মুদ্রিত। দাম দুই টাকা।
প্রচ্ছদমুদ্রণঃ রূপসা এন্টারপ্রাইজ, ২০০ বি বি গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলকাতা ১২